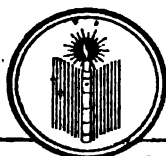
বাংলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি

গোপাল হালদার



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা – ৬

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩ আষাঢ়
মূল্য : তিন টাকা আট আনা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আলোচনা সাহিত্য : সংস্কৃতির রূপান্তর (৩য় সংস্করণ)
বাঙলা সংস্কৃতির রূপ (ছাপা নাই)
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
স্বপ্ন ও সত্য (যন্ত্রস্থ)
বাঙলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (যন্ত্রস্থ)

লঘু রচনা : আড্ডা (যন্ত্রস্থ)

কথা-সাহিত্য : একদা, অন্যদিন, আর একদিন ॥
ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলা ॥
ভাঙন, স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা ॥

প্রকাশ করেছেন : শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ৪২নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি, এম, লাইব্রেরী থেকে, ছেপেছেন : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ২৬নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ থেকে।

শ্রীযুত সরোজ আচার্য

সুহৃদ্বরেষু



নিবেদন

একটা বিশেষ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে নানা সময়ে লিখিত হয়েছিল। সেই প্রশ্নটা এই—আধুনিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতি কী, আর বাঙলা সাহিত্যে কী ভাবে তা প্রকাশ লাভ করেছে। গ্রন্থের নামকরণে সে বিষয়টি পরিষ্কার হল কিনা জানিনা।

আলোচ্য মূল কথাটি ছাড়া আলোচনার ক্ষেত্রটি হচ্ছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ করে তার কথা-সাহিত্যের সাক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক কালের ছোটগল্পের অবস্থা পর্যন্ত আমি আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

এই দু'টি সংযোগসূত্রের বাঁধনে যা বাঁধা পড়েছে সে প্রবন্ধগুলির গায়ে সাময়িকতার ছাপ আছে, তর্ক ও বিতর্কের রেশ আছে, মাঝে মাঝে পুনরুক্তির প্রয়োজনও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দু একটিতে ভাষায় ও ভঙ্গিতে ও পার্থক্য দেখা যাবে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত করবার কালে আমি সেই জন্ম-দাগগুলো দূর করা ততটা প্রয়োজন মনে করলাম না—সামান্য সংযোজন ও সংশোধন অবশ্য করেছি।

প্রবন্ধগুলি অন্যোন্য-নির্ভর। সতীর্থ ও ছাত্রবন্ধুরা কেউ কেউ এ প্রবন্ধগুলি একত্রে পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা ক্ষান্ত না হয়ে বৃদ্ধি পেলেই আমার প্রয়াস সফল জ্ঞান করব। ইতি

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬১ লেখক

কলিকাতা

"নিজের সুখ দুঃখের দ্বারাই হ'ক, আর অন্যের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হ'ক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হ'ক আর মনুষ্য চরিত্র গঠিত করেই হ'ক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্যে আর সমস্ত উপলক্ষ্য।"

রবীন্দ্রনাথ

সূচী

আধুনিক সাহিত্য

'আধুনিক সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে—'আধুনিক সাহিত্য' বল্‌তে সত্যই কিছু আছে কি? তা কি পুরনো সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র? কি অর্থে স্বতন্ত্র?

আলোচনায় অগ্রসর হবার আগেই বোধ হয় দু' একটা কথা বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমত, সাহিত্য অনেকাংশেই মানুষের মনের সৃষ্টি, মানস-ক্রিয়া; অবশ্য কোন মানস-ক্রিয়াই একমাত্র মানস-জাত নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনের ফসল বলেই সাহিত্যের এমন মাপকাঠি পাওয়া শক্ত যা সবাই মেনে নেবে। বহির্জগতের জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তারও বাজার অবশ্য ওঠে নামে, তবু মোটের উপর তা নিয়ে আমাদের কেনাবেচা করতে হয়, আমরা তার একটা ব্যবহারিক হিসাব পাই। কিন্তু যে জিনিস প্রধানত মনের সৃষ্টি তার সংবন্ধে তেমন মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। এমন কি, সাহিত্যের কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে কি না তাও প্রত্যক্ষ বোঝা যায় না। কারণ, সাহিত্যের মূল্য হচ্ছে মনের কাছে; অন্তরাবেগের কাছেই মুখ্য ভাবে, তবে যুক্তির কাছেও গৌণ ভাবে। এই সব জটিল কারণে সাহিত্যের সর্বস্বীকৃত মানদণ্ড বড় নেই। নির্ভর-যোগ্য মানদণ্ড অবশ্য বারে বারে গড়ে উঠে, কিন্তু কালে কালে

তা বদলায়। তাই এক-এক সমাজে, এক-এক শ্রেণীতে সাহিত্য বিচার এক-এক রূপ। এমন কি যাঁরা মোটামুটি একই দৃষ্টি-ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য আলোচনা করেন, একই জীবন-দর্শন যাঁদের জীবনের অবলম্বন, অনেক সময়ে দেখি, তাঁরাও সাহিত্যক্ষেত্রে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে পারছেন না। তা'ই সাহিত্যের বিচারে যাঁদের মনের মিল আছে তাঁদেরও দেখা যায় বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টির মূল্য সংবন্ধে মতের মিল ঘট্‌ছে না। তা ছাড়া, সাহিত্যেও বাজার-দর তো সর্বদাই ওঠে নামে। যা তবু সব বাজার-দরের ব্যাপারেও মনে রাখা দরকার তা এই—প্রথমত, ব্যবহার্য পণ্যের বাজার-দরের সঙ্গে তার মূল্যের সাধারণত একটা সম্পর্ক থাকে,—দর জিনিসটা সব সময়েই একেবারে খামখেয়ালি নয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের মনের মূল্যবোধ আমাদের দশ জনের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই, দশটি মনের আদান-প্রদানের ফলে আবার প্রত্যেকের নিজের নিকট স্থির হয়ে ওঠে।

গোড়ার কথাটা তা'ই এই: সাহিত্য সংবন্ধে আমাদের আলোচনায় ব্যক্তিমনের গুণাগুণের ছাপ লেগে যেতে পারে; তাই এখনো কোনো বিচার চরম বিচার বলে গণ্য নয়। আসলে 'চরম বিচার' বলে কিছু নেইও, আছে একটা আপেক্ষিক মূল্য-নির্ধারণ। আর এই আপেক্ষিক মূল্যও গড়ে ওঠে, স্থির হয়ে আসে এমনি নানা মনের নানা ধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে।

আলোচনার দৃষ্টিক্ষেত্র

দ্বিতীয় কথাটি এই—সাহিত্য সংবন্ধে আলোচনা নানা দিক্ থেকে চলে। এক-এক কালে এক-এক দিকে তার রেওয়াজ বেড়ে যায়; যে কালের যেমন জীবনাদর্শ সে কালের বিচারও হয় মোটের উপর সে ধারায়। কিন্তু কাল বদল হয়, জীবনাদর্শ বদলে যায়, ফলে সাহিত্যাদর্শও তেমনি বদলে যায়। আমাদের দেশে দশ বৎসর আগে পর্যন্ত (প্রায় ১৯৩৯ ইং) যে বিচার একচ্ছত্র ছিল সে হল 'রসের বিচার' অথবা 'আর্টের হিসাব'। আজ সে বিচারকে একান্ত করে হয়ত অনেকে মান্তে চায় না। অনেকে 'ঐতিহাসিক বিচারের' পক্ষপাতী। কিন্তু 'ঐতিহাসিক বিচার' বল্‌তে যে সবাই আমরা এক কথা বুঝি তাও নয়। 'ঐতিহাসিক' কথাটির অর্থ এ ক্ষেত্রে অনেকেই ধরেন "কালানুক্রমিক" বলে, অনেকেই বলেন "বাস্তব"। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার শুধু জড় বস্তুর কালানুক্রমিক হিসাব নয় তাও আমরা অনেকেই মানি। ইতিহাসে আমরা কি দেখি? ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখিছি চেতনাচেতনের সংঘাত, বিকাশ, জীবনের অভিযান। এ চক্ষে মানুষের সৃষ্টিকে দেখে অনেকেই আমরা আজ সাহিত্যের বিচার করি জীবন-বাণী হিসাবে। এ অর্থে আমরা সাহিত্যকে "জীবনের শুধু মুকুর" হিসাবেও দেখি না। জীবন সাহিত্যের মধ্যে মুকুরিত তো হয়ই, তানিঃসন্দেহ; কিন্তু সাহিত্যের থেকে জীবনও সংগ্রহ করে উপজীব্য, পরিণতির

প্রেরণা, বিকাশের আভাস। সত্যই তা'ই সাহিত্যের একটা বড় রকমের ব্যবহারিক মূল্য আছে। Life-ই literatureকে মূলত create করে, আর এই শেষের অর্থে literatureও আবার create করে lifeকে—অন্তত great literature তা'ই করে।

কাজেই সাহিত্যকে আমরা এরূপ নানা দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে দেখি বলে আলোচনা এত ভিন্নমুখী হয়। সব ক্ষেত্র থেকেই হয়ত তার একটা মুখ দেখা যায়। কিন্তু যা তার 'দক্ষিণ মুখ'—যে মুখে তার জীবনের বাণী উচ্চারিত হয়—সে মুখ থেকে দেখলেই আমরা পাই পরিত্রাণ। মোটামুটি এ কালে আমরা সাহিত্যের সে মুখই দেখতে চাই, সাহিত্যকে বুঝতে চাই জীবন-দর্শন হিসাবে, সৃষ্টি হিসাবে এবং নবতর সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে।

'আধুনিক সাহিত্য'ও তা'ই এই আধুনিক কালের সৃষ্টি, এ কালের জীবন-দর্শন; আবার নতুন কালের সৃষ্টিরও প্রেরণা, তার জীবন-দর্শনেরও প্রস্তাবনা।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্য কাল হিসাবে আধুনিক। কিন্তু শুধু এ বললে সে কথার কোনো মানে হয় না। 'অধুনা' বল্‌ব কোন্ কালকে? কখন থেকে তার শুরু? কি তার জীবন-ক্ষেত্র, কি তার জন্ম-লক্ষণ, আর কি-ই-বা তার জীবন-লক্ষণ? এবং সে কাল কি একেবারে স্থির অচল হয়ে আছে?—এ সব প্রশ্নও মনে উঠবেই।

জন্ম-চিহ্ন

তবু মোটের উপর কাল হিসাবে আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যের এরূপ ভাগ একেবারে মিথ্যা নয়। আমরা মধ্যযুগের যে-কোনো সাহিত্য হাতে নিলেই বুঝি তা এ কালের নয়। আর সত্যই আধুনিক কোনো সাহিত্য হাতে নিলেও বুঝি পূর্বযুগে তা লেখা হতে পারত না। ধরুন ভারতচন্দ্র—মাত্র সেদিনকার লোক তিনি আমাদের দেশে ; আর খুব বেশি রকমের কলাকুশল কবি, তা'ই, তাঁকে নিচ্ছি। আমরা বেশ বুঝতে পারি—যত লিপি-কুশলতা থাক্ তাঁর লেখায় তা আধুনিক কবিতা নয়। অন্য দিকে নিই আজকের কবিদের—ধরুন নজরুল,—বুঝতে পারি এ কবিতা এদেশে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারত না। অথবা ধরুন—সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যায়িকা, বা কাশীদাসের লেখা কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাৎ আর আমাদের একালের "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ"। একই গল্প, কিন্তু পড়েই আমরা বুঝি এই শেষ কবিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারে না—এমন কি, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর কেউ তা লিখতে পারেন না। অথচ গল্প তা সেই একই।

কি ভাবে আমরা তা বুঝতে পারি, তা'ই ভেবে দেখ্‌বার মত।

অনেক ছোটখাটো "জন্মচিহ্ন" থাকে প্রত্যেক লেখার গায়ে, তা দিয়ে তাদের কাল ঠিক পাওয়া যায়। সে সবকে মিলিয়ে আমরা বল্‌তে পারি—তাই "যুগধর্ম।" বোধ হয় তার থেকে

আরও যথার্থ নাম হয় 'পরিবেশের ধর্ম'। মানে দেশ-কালের যৌগিক ছাপ, শুধু যুগের একান্ত ছাপ নয় পারিপার্শিকেরও ছাপ —পরিবারের এবং পরিবেশের গুণাগুণ। প্রত্যেক লেখাতেই এ সব কম-বেশি থাকে। যাকে আমরা বলি কবির 'নিজস্ব বৈশিষ্ট্য', তারও দু'টা দিক্ আছে—এক দিকে তা কাল থেকে কবির সংগ্রহ, আর দিকে তা কালকে কবির যোগানো।

বিষয়বস্তু ও রূপ

এই "ছাপ" জিনিসটিকে বিশ্লেষণ করলে মোটের উপর তার দু'টি দিক্ দেখতে পাই। এক, বিষয়-বস্তুর বা Content এর দিক্, দুই, প্রকাশের, রূপায়ণের বা Form এর দিক্। এ দু'টি কিন্তু পরস্পর নিঃসম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন দিক্ নয়। বিষয়বস্তু আর প্রকাশ-কলা দু'য়ে মিলে সাহিত্য একটি অখণ্ড সৃষ্টি হয়ে ওঠে বলেই সাহিত্য গ্রাহ্য হয়। খুব একটা মোটা তুলনা দিলে বলা যায়, দেহ আর মন দু'য়ে মিলেই যেমন মানুষ, এও তেমনি। একটা আরটার থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, এমন কি, দু'য়ের সমন্বয় না হলে সাহিত্যে কোনোটারই বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। যে রচনায় এ দু'য়ের সুসঙ্গতি ঘটে তা অখণ্ড হয়, সৃষ্টি হয়; যাতে এ সঙ্গতি যত কম তা 'সৃষ্টি' হিসাবে তত কম সার্থক। আমরা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই শুধু এদের স্বতন্ত্র করে নিতে পারি।—

সৃষ্টির মধ্যে বিষয়-বস্তু আর প্রকাশ-কলার তেমন দ্বৈত অস্তিত্ব থাকা নিয়ম নয়।

অবশ্য বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণের দিক্ থেকেও এ হল সাহিত্যের খুব মোটা রকমের ভাগ। কারণ, বিষয়বস্তুকেও আবার অন্তত দু' দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে : এক, কথা-বস্তু হিসাবে, দুই, ভাব-বস্তু হিসাবে। তাজমহলের কথা-বস্তু তো তাজমহল ও সাজাহান কিন্তু ভাববস্তু হয়ে উঠল বিচিত্র আর মহৎ—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ, জীবনের রথ তোমাকে নিয়ে ছুটল লোক-লোকান্তরে। শকুন্তলার বিষয়-বস্তু মহাভারতে আছে ; তা'ই মূলত কালিদাসের গল্পাংশ। কিন্তু মহাভারতের ও সেই নাটকের ভাব-বস্তুতে কি তফাৎ ঘটেনি ? তার পরে কালি-দাসের আর বেদব্যাসের বিষয়বস্তু কি আর এক বলা সম্ভব? উপনিষদ্, বৌদ্ধ-কাহিনী ও শিখ গুরুদের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রকাশ-কলা যে একবারে স্বতন্ত্র তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর ভাববস্তুই কি আর সম্পূর্ণ পূর্ববৎ আছে ? আবার, কথাবস্তু স্বতন্ত্র হলেও ভাববস্তু যে মোটের উপর একরূপ হতে পারে তাও আমরা জানি—আসলে এই ভাববস্তুই হল আইডিয়ার দিক্, বাণীর দিক্, messageএর দিক্। আর যেখানে সৃষ্টিতে তা রূপান্বিত হয় না, সেখানে এ ভাববস্তু তত্ত্ব মাত্র থেকে যায়, সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য হয় প্রকাশে ও রূপায়ণে, সার্থক হয় 'অর্থ' লাভ করলে। এই অর্থেই লেখার আসল মূল্য—তার significance বা তাৎপর্য।

এ জন্যই আবার প্রকাশের বা রূপের দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করলে কেউ কেউ সাহিত্যকে শুধু 'আর্ট' বলে সিদ্ধান্ত করেন ; বলেন রূপকলা বা প্রকাশকলাই হল সৃষ্টির আসল রহস্য ! এই রূপকলাকে আবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারও নানা দিক্ আছে—রীতি বা ষ্টাইল, আঙ্গিক (টেক্‌নিক্), অলঙ্কারভঙ্গি—নানা কলাকৌশলের দিকে ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। ও সব জিনিসে পাঠকের দৃষ্টি বরং সহজেই পড়ে,—আর দৃষ্টি-বিভ্রমও তাতে ঘটে। সংস্কৃতের সাহিত্য-শাস্ত্রীরা রসশাস্ত্র নিয়ে মেতে যেমন ভাববস্তুর নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন, অন্য দিকে আবার অলঙ্কার-শাস্ত্র নিয়েও তেমনি বাড়াবাড়ি করেছেন। সে সবে তাঁদের বুদ্ধির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শুধু বিশ্লেষণে যে সাহিত্যের সত্য টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় অথচ সাহিত্যের মূল সত্যও ধরা পড়ে না, সেই বিশ্লেষণে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আসলে যা মনে রাখবার মত কথা তা এই : 'শারীর-তত্ত্ব জানা থাক্‌লে মানুষকে বুঝতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু শুধু সে সব তত্ত্ব মিলিয়ে মানুষের শরীর গঠন করা যায় না,—প্রাণ তো পাওয়া যায়না, মনও ফাঁকি দেয়। দেহ-মনের বিচিত্র লীলাতেই জীবন ; তা'ই সাহিত্যের বস্তু, তাতেই সৌন্দর্য—সে জীবন অর্থ অলঙ্কারনয়, 'শুধু দেহ নয়, শুধু মনও নয়।' তবু সেই জীবন-রহস্যকে আরও ভালো করে চিন্‌বার জন্যই দেহের কথা, মনের কথা, সব কথা বোঝা চাই।

পরিবর্তিত মূল্যবোধ

কিন্তু কথা এই—এই বিষয়বস্তু ও রূপ দুই-ই আবার কাল থেকে কালে বদলায়। এবং আধুনিক সাহিত্যের ও পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে বিশেষ ছাপ দেখি তা এ দুই দিকেও বিশেষ-বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা যায়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু বদ্‌লেছে আর রূপায়ণের পদ্ধতিও বদ্‌লেছে। আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু কত বিচিত্র তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কারণ, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রসার বেড়ে গিয়েছে। আর, আধুনিক সাহিত্যের শুধু নানা বিভাগগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায় যে আধুনিক সাহিত্যে এই সহস্রমুখী জীবনকে প্রকাশ করবার জন্য কত বিচিত্র পথের আশ্রয় নিয়েছে—সেকালের মহাকাব্য, খণ্ডকাব্যের জায়গায় এসেছে গদ্য ও পদ্যের কত বিচিত্র ধারা · আর তারও পরে কত অদ্ভুত নিত্য নূতন ছন্দ, রীতি, টেক্‌নিক্, তার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। অবশ্য পুরনো যা তা সমূলে বাতিল হয়ে গিয়েছে, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তবে তার অনেকাংশ আজ আর চল্‌তে পারে না। মানুষ এখনো দেব-দেবীকে মানে, কিন্তু তাই বলে চণ্ডীমঙ্গল আর তেমন করে সে লিখ্‌বে না। কালকেতুর কাহিনীর ভাববস্তু অচল এখনো হয়নি—মানুষের দুঃখ-বেদনা নিয়তি এখনো লেখা হচ্ছে গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কিন্তু মঙ্গলকাব্য আর লেখা হয় না। সেই কথাবস্তু একেবারে বদ্‌লেছে, সেই প্রকাশ-পদ্ধতিও একেবারে বদ্‌লেছে—যদিও সে তুলনায় ভাববস্তু বদ্‌লেছে কম।

মানুষের মূল্য

সাহিত্যের ভাববস্তুও যে নিতান্ত কম বদ্‌লেছে তা নয়। আমাদের দেশের দৃষ্টান্তই ধরা যাক্। দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, অকালে মানুষ মরছে ; প্রজারঞ্জক রাজা শ্রীরামচন্দ্র বুঝছেন তার কারণ শূদ্র বেদপাঠ করছে। অতএব, শম্বুকের শিরশ্ছেদ হল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে শূদ্রের বেদপাঠের সম্পর্ক আজ আমরা মানি না ; কারণ মানুষের মর্যাদা খানিকটা আজ আমরা বুঝি। উত্তর-বিহারের ভূমিকম্পের কারণ হিন্দুদের হরিজনদের প্রতি অবজ্ঞা, গান্ধীজী এ-কথা বললেও আমরা কুণ্ঠিত হই :—এরকম 'পাপে' ও-রকম 'দণ্ড' হয় তা আমরা মান্‌তে পারি না। তবু পুরনো দিনে হয়ত মানুষ তা'ই মানত। ধূমকেতু উঠলে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে, এ তারা মানত ;—এখনো আমরাই কি 'চেতাবনি' মানি না? যাই হোক্, কথাটা এই : একদিন শম্বুকের শিরশ্ছেদে সাহিত্যিক দেখেছেন রাজার সুবিচারের চমৎকার প্রমাণ। একশ' বছর আগেও আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিশ্চয় এ চক্ষেই দেখ্‌তেন সে কাহিনী। কিন্তু আজ আমরা তাতে দেখছি রাজশক্তির এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একটা মূঢ় অবিচারের প্রমাণ। কারণ মোটামুটি man's man for a that.

মানুষের মর্যাদা, একথাটা আজ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিকট প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ; তবু তা 'একান্ত' বা 'চরম' সত্য হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। সর্বক্ষেত্রে সর্বরূপে মানুষকে আমরা এখনো

মর্যাদা দিই না—এখনো সাত কোটি অচ্ছুত রয়েছে। আর অচ্ছুত ছাড়াও প্রায় সব দেশেই এখনো চাষি-মজুরের সমাজ আর ভদ্রলোকের সমাজ স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, কথাটা সরলভাবে বলা হলেও আজকের সমাজের এটা মোক্ষম কথা—মুটে-মজুর চাকর-পিয়াদা ওদের পনের টাকা মাইনে ও পিঁপড়ের আহারই যথেষ্ট, আর মন্ত্রী উজীর এঁদের পনের শ' টাকা আর হাতীর খোরাক না হলে চলবে কেন? এ কথার মানে, সব মানুষ মানুষ নয়, কেউ পিঁপড়ে-জাতের মানুষ, কেউ হাতী-জাতের মানুষ। তবু মোটের উপর বেদ-পাঠক শূদ্রদের জন্য শিরশ্ছেদ বা তপ্ত শলাকার ব্যবস্থা করলে আমরা অনেকেই তা সইব না। কারণ, হাজার হোক্ মানুষ মানুষ, এ-ও আমরা আজ মানি।

অর্থাৎ এদিকে আমাদের মূল্যবোধ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মূল্যবোধ থেকে বেশ স্বতন্ত্র। পুরনো মূল্যবোধ বদ্‌লে গিয়েছে। আর এদিকের এই বিশেষ পরিবর্তন একটু মৌলিক—তা শুধু সামান্য আচারগত বা আচরণগত পরিবর্তন নয়। দয়া-মায়ার এক-আধটুকু উনিশ-বিশ মাত্র নয়। এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে দেব-দেবী ও আগেকার ধর্মাধর্মের বোধ সাহিত্যে গৌণ হয়েছে—সাহিত্যে প্রধান হয়েছে মানুষ—পৃথিবী আর জীবন।

আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য—এই হল আধুনিক সাহিত্যের সংবন্ধে প্রধান কথা। মানব-সত্য নিয়েই আধুনিক সাহিত্য।

ব্যক্তিত্বের মূল্য

মানুষের সংবন্ধে আমাদের মূল্যবোধ ক্রমশঃ আধুনিক যুগে গভীর ও নিগূঢ় হচ্ছে। রামায়ণের আর একটি দৃষ্টান্ত নিই। কারণ, রামায়ণ অমর সাহিত্য।—আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র। কী আশ্চর্য তাঁর পত্নী-প্রেম। পিতা যাঁর সাড়ে সাত শত বিবাহ করেছিলেন সেই রাজা এক পত্নীর বেশি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করলেন না। এমন কি, পত্নীকে বনবাস দিতে হলে স্বর্ণ-সীতা নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, তবু দ্বিতীয় মহিষী গ্রহণ করলেন না। বলতে হবে, এরূপ একনিষ্ঠ প্রেম সে যুগে অসাধারণ। কেমন করে, সে কালের কবির চক্ষে এ আদর্শ স্পষ্ট হয়েছিল, কে জানে। কিন্তু এ আদর্শের থেকেও সেই রামচন্দ্রের পক্ষে আরও বড় আদর্শ ছিল—তাই বিনা দোষেও তিনি সীতাকে বনবাস দিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। রাজার উপযুক্ত কাজ হয়েছে, এ দেশের সবাই বলবে। কিন্তু আজ আমরা কেউ কেউ তাতেও নিজেদের সংশয় প্রকাশ করতে পারি---মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন কি শ্রীরামচন্দ্র? নিজের প্রেম, সীতার প্রেম এ সব কি রাজার রাজত্বে বা রাজ কর্তব্যের থেকে তুচ্ছ? অন্তরের ভালবাসাকে বাইরের সমাজের (অযৌক্তিক) দাবীর কাছে বলি দেওয়াই কি সত্যধর্ম? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমস্ত ভারটা এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দিকে পড়ছে, তা আমরা জানি। আজ শ্রীরামচন্দ্রের এ প্রজারঞ্জনে আমাদের আর তত

অবিচলিত আস্থা নেই। আমরা ব্যক্তির অধিকারও আজ মানি; রাজত্বের থেকে ভালোবাসা কম নয় বলে জানি। তা'ই ডিউক অব্ উইণ্ডসরের অন্যপূর্বা-রমণীর জন্য সিংহাসন ত্যাগকেও নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে করি না। আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার আমাদের নিকট শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে উঠেছে। আমরা কি সুস্থির ভাবে আজ বল্‌তে পারি—কে বেশী সমর্থন-যোগ্য,—পত্নীত্যাগী শ্রীরামচন্দ্র, না সিংহাসন ত্যাগী উইণ্ডসর? অবশ্য একটা কথা,—আজই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট ব্যক্তির দাবীর সীমাটাও আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—ব্যক্তির দাবী আবার সমাজ প্রগতির অনুযায়ী হয়ে না উঠ্‌লে আমাদের চোখে সংশয়ের বস্তু হয়ে পড়ছে—আমরা একথাও মান্‌ছি "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" অর্থাৎ এই বিংশ-শতকে এসে আমরা ক্রমেই আবার নূতন ধারায় সমাজ-সচেতনও হয়ে উঠ্‌ছি। কাজেই ব্যক্তির 'অন্তরের দাবী'কে তেমন সব ক্ষেত্রে এক তর্‌ফা ডিক্রী আর দিতে পারছি না। এ বোধ অবশ্য অনেক সমাজেই এখনো ঝাপ্‌সা; ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাই প্রচলিত বাজারে 'তেজী' চল্‌ছে। মোটের উপর আমরা বুঝ্‌ছি ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তি-স্বরূপের দাবী একটা বড় সত্য—ব্যক্তির আত্ম-বিলোপ চরম কিছুই নয়।

পুরনো সাহিত্যের তুলনায় আজ এদিকে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসার মূল্য

অনেক বেশি। এ মূল্য পরিবর্তন কেবল একই আদর্শের উনিশ-বিশে ওঠা-নামা মাত্র নয়। এতবড় পরিমাণগত এই পরিবর্তন যে একেও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং মৌলিক পরিবর্তন বলে মান্‌তেই হবে।

"বিপ্লবী-নিয়তির" স্বীকৃতি

এমনি আরও নূতন মূল্যবোধও আধুনিক সাহিত্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে—হয়ত এখনো তা দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারেনি। অন্তত মানুষের মূল্যও এবং ব্যক্তিত্বের মূল্যের মত সে-মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকার্য হয়ে ওঠেনি। যেমন, পুরনো সাহিত্যে দেখি মানুষ যত বড়ই হোক্ সে ভাগ্যের দাস। বিশ্বকর্মা নূতন পৃথিবী গড়বার স্পর্ধা করে, এটা মানুষের নিকট সে-দিন ঠেকেছিল ভয়ঙ্কর ও হাস্যকর। তবু, একমাত্র দেবদেবীর খেয়াল-খুশীর উপর মানুষের ক্রমেই অনাস্থা এসে গেছল। অপ্রাকৃতে অবিশ্বাস আসছি্‌ল; কিন্তু নিজের শক্তিতে আস্থা পুরোপুরি আসছিল না। এখনো কি তা এসেছে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দানে নিজের উপর মানুষের বিশ্বাস জাগছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ দেখে মানব-ভাগ্য সংবন্ধে আরও নিরাশা আমাদের চেপে ধরছে—এটোম বোমা দেখে আজ আমাদের ভীতি ও নিরাশা বেড়ে গেছে। কিন্তু পুরনো কালের স্বর্গ, পরকাল, বিধিলিপি, প্রাকৃতির নীতি, "নিয়তি-

নিয়ম', প্রভৃতি ধারণার জায়গায় ক্রমেই এসেছে ইহজগৎ ও নর-জীবনের প্রতি আস্থা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের "বিশ্বলীলা", বিশ্বরহস্যের" ধারণা। অর্থাৎ বুঝেছি মানুষ নিষ্ক্রিয় নেই, সক্রিয়ই ; তবে সেই খেলা নিয়ম তার সাধ্যাতীত।

এই ছিল এত দিনকার পরিচিত চিন্তা—"মানব-ভাগ্য" সংবন্ধে। কিন্তু আজ আর-একটা চিন্তাও এরই সঙ্গে সঙ্গে উঁকি মারছে—মানুষ তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে প্রকৃতির নিয়মকে যত বুঝছে তত প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এমন কি মানব-প্রকৃতিকেও সে করতে পারে পরিবর্তিত, বিকশিত আর প্রকাশিত। মানুষের এই "বিপ্লবী-নিয়তি" হচ্ছে মানুষের আধুনিকতম আবিষ্কার। ক্রমশই মানুষ বুঝছে সে সৃষ্টির অধিকারী, নতুন নতুন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টির দুয়ার খুলে দিচ্ছে চিরকাল। এই যে মানুষের অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস, প্রকৃতির মহারাজ্যে মানুষের অভাবনীয় সম্ভাব্যতায় আস্থা, আর মানুষের এই বিপ্লবী ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ—নিজের সংবন্ধে মানুষের এই মূল্যবোধ,—আজও মানুষের ইতিহাসে তা নতুন, —তবু এইটিও আধুনিক সাহিত্যে আমরা দেখেছি, এখন ফুটে উঠছে।

কিন্তু প্রশ্ন হবে পুরনো সাহিত্যে কি এসবের কোন চিহ্ন পাই? আমরা গ্রীক্ নাটকের ও সেক্‌সপীয়রের লেখা—What a piece of work is man থেকে, আরও এখনকার ওখানকার সাহিত্য থেকে কথা তুলে দেখাতে পারি—মানুষ নিজের মহিমা

আগেও উপলব্ধি করতে পারছিল। সে সব কথার স্থির তাৎপর্য পরে দেখব। কিন্তু এখানে যা আমাদের লক্ষণীয় তা এই—নিজেকে স্রষ্টারূপে, বিপ্লবী-শক্তির বাহকরূপে এই বিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষ এমন স্পষ্ট করে ভাবতে সাহস করত না। সেরূপ ভাবনা ছিল তার তখনকার বিবেচনায় মূঢ়তা বা বিকৃত দম্ভ—বিশ্বকর্মার ও ফাউষ্টের দুর্বুদ্ধির কাহিনীই তার প্রমাণ। এ ধারণার ক্রমে পরিবর্তন হল। প্রথম এল রিনাইসেন্স—জগৎ ও জীবন সংবন্ধে বিস্ময়। তার পরে এল ফরাসী-বিপ্লবের শেষে "প্রোমিথিউস্ অনবাউণ্ডের" স্বপ্ন-যুগ এবং স্বপ্ন-ভঙ্গেরও যুগ; এল টেনিসন-আর্ণল্ডদের যুগ; আর ওদিকে হুইট্‌ম্যান এদিকে ব্রাউনিংএর নতুন আশাবাদ—সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিজ্ঞানের বিজয়োৎসবের দিন। তার শেষে এল সন্ধ্যা, শেষে নিশীথ রাত্রি, ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বর্তমান বিলাপ—প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই তার প্রারম্ভ, আজও তার শেষ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে আবার মানুষের বিজয়ে নতুন আস্থা, তার বিপ্লবী শক্তির নতুন স্বীকৃতিও এসেছে—এই বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় পাদে।

মানবত্তাবাদ

আধুনিক সাহিত্যে যে আধুনিক তা এইরূপে বুঝা যায় তার এই নতন মূল্যবোধ থেকে। সেই সাহিত্যের বিষয় বা ব্যক্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এতক্ষণ দেখছি; বুঝছি তার মূল্য-

বোধ বদ্‌লেছে। অন্ততঃ তিনটি প্রধান দিকে মানুষের মূল্যবোধ আজ নতুন—যেমন, প্রথমত, নরমানুষের মর্যাদাবোধ; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি; আর মানুষের বিপ্লবী-নিয়তিতে বিশ্বাস। অবশ্য এ তিনটি ছাড়া আরও অনেক নতুন বক্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন, নতুন সমাজসত্তা বা নতুন সঙ্ঘচেতনা (social egoতে বিশ্বাস), এমন কি নতুন বিশ্ব-মানবতাবাদ (internationalism), তেমনি নতুন 'জাতীয় আত্মাবাদ' (national self), ইত্যাদি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখব, কম বেশি এ সবই এক-না-এক দিকে পূর্বকথিত ঐ তিনটি মূল সুরের বাদী-প্রতিবাদী সুর। অবশ্য আর একটি কথাও এদিকে লক্ষণীয়। আসলে ইতিহাসের একটি কথাই এখানে পাই :— মূলতঃ স্ফিংক্‌সের প্রশ্নের যা উত্তর এ সাহিত্যেরও উত্তর তা জীবন-রহস্যের সামনে ; সে উত্তর—"মানুষ।" অত্যন্ত পুরাতন এই কথা—কিন্তু আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান কথা এই "মানবতাবাদ'

প্রাচীন মানবতা-বোধ

কথা হবে, এ তো অতি-পুরাতন কথা। আমরা কি প্রচীন সাহিত্যে এই মানবতাবাদ পাই না? পশ্চিম দেশের কথা ভাবলে গ্রীক্‌দের সাহিত্য ও শিল্পের কথা এখানে আমরা স্মরণ

করব—স্মরণ করব প্রাচীন লাতিন ও ইতালীয়দের অনেকের কথা; তার পর রিনাইসেন্স ও বোকাচিয়ো প্রভৃতি লেখকদের কথা। পরে আসেন মার্লো আর সেক্‌স্‌পীয়ার। পূর্বদেশে অন্যদের কথা ভালো জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই-চীনা শিল্প ও সাহিত্য এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত। তাতে সুরটা বেশ পার্থিব এবং সামাজিক, বিশেষত পারিবারিক। শেষে অবশ্য স্মরণ করব আমাদের নিজেদের শিল্প-সাহিত্যের কথা। আমরা বলি, আমরা কি মানুষের মর্যাদা কম করেছি? দেবতাকে পর্যন্ত আমরা মানুষ করে তুলেছি। আমাদের অবতার শ্রীরামচন্দ্র; তিনি পুত্রের রূপে, অগ্রজের রূপে, স্বামীর রূপে, রাজার রূপেও মানুষ হয়ে আমাদের মধ্যে গ্রাহ্য হলেন। আমাদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ; তিনিও শত সত্ত্বেও মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে মানুষ হয়ে আমাদের কল্পনায় আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে দেবতা তিনি নন, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে "বৈষ্ণবের গান"ও নয়। বরং আমাদের মধ্যযুগের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির মুখেই প্রথম শুনেছি এই আশ্চর্য বাণী—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য—
তাহার উপরে নাই।"

যত দূর জানি, পৃথিবীর অন্য কোনা সাহিত্যে এ সত্য এমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বাণীরূপ লাভ করেনি—এ যুগেও লাভ করতে পারেনি। তাই প্রশ্ন হবে—তা হলে মানবতাবাদকে আমরা

আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ বাণী বলি কোন্ যুক্তিতে? আর আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই বা তফাৎ দেখি কিসের?

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরই প্রথম বুঝে নিই। আমরা দেখেছি আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার বাণীতে আর তার রূপ-রচনায়। কিন্তু যা সেই সঙ্গে স্মরণীয় তা এই: অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে যা কাল হিসাবে আধুনিক হয়েও এই দুই দিকেই আধুনিক নয়। এমন অনেক পুঁথি পাঁচালি এখনো রচিত হয় যাতে এই বৈশিষ্ট্য নেই, কিম্বা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত গৌণ। যেমন ষাট্ সত্তর বৎসর আগেকার এক-এক জন আধুনিক কবিও আমাদের দেশে পুরনো চালে কবিতা লিখতেন—'কে তুমি রে বল পাখী' ইত্যাদি। এ রকম লাইন শুনলেই মনে হবে এ কবিতা আধুনিক নয়; তারও ষাট্ বৎসর আগেকার কীট্সের নাইটেঙ্গেলের তুলনায় তা কত সেকেলে—ভাবে এবং রূপে। অথচ যদি বলি—

'বেঁচে থাক' মুখুজ্জের পো! একটি চালে
করলে বাজি মাৎ।"

তা হলে একালেরও অনেকের পক্ষে বলা শক্ত হবে এ কোনো জীবিত কবির রচনা, না, পরলোকগত কবির রচনা। এই কবিতাংশ শুনেই মনে হয় 'আধুনিক'। কেন তা মনে হল? কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় অখণ্ড; কাজেই সর্ব কালেই সার্থক। কিন্তু তার 'আধুনিকতা' বিশেষ করে এ জন্য যে, প্রথমত, এর ভাববস্তু ও কথাবস্তু জীবন্ত—মানুষের কথা, মানুষী ভাষায় বলা।

দ্বিতীয়ত, এর ছন্দ হচ্ছে ছড়ার ছন্দ, বাঙলা কথার জীবন-ছন্দ, —আশ্চর্য রকমের যা একালেরও ছন্দ। অর্থাৎ এ কবিতার প্রাণ হচ্ছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য নয়, জীবন্ত সমাজের কথা, সাধারণ মানুষের ভাব ও ভাষা। কবি হেমচন্দ্র তাঁর বিদ্রূপের কবিতায় যত 'আধুনিক', 'বৃত্রসংহারের' কবি, এমন কি 'ভারত-ভিক্ষার' কবি হিসাবেও ততটা 'আধুনিক' নন। তেমনি যত বড় কবি হোন হেম-নবীন আজ আমাদের চক্ষে মনে হয় 'মহিলা' কাব্যের কবি বা 'সারদামঙ্গলের' কবি তাঁদের অপেক্ষাও বেশি আধুনিক। ঐ হিসাবেই মাইকেল বাঙলা কাব্যের বিষয়-বস্তুতে ও রূপায়ণে বিপ্লব আনেন ; এবং আর এক দিকে বঙ্কিমে বাঙলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রারম্ভ :

নভেল প্রায় জন্মাবধি মানুষের কথা। মানুষের চরিত্র আর ঘটনা নভেলের প্রধান বস্তু। নভেল জন্মেছেও আধুনিক কালে— যখন থেকে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য, বিশিষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিম থেকে আমাদের সাহিত্যে সেই নভেল শুরু হল। বুঝতে পারি— পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে আধুনিকতার এই প্রধান বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের কালে সর্বগ্রাহ্য হচ্ছিল। ঠিক এই কারণেই মুকুন্দরামের অঙ্কিত চণ্ডীমঙ্গলের মানুষগুলোকে দেখেও আমরা তৃপ্ত হই—বুঝি এ হচ্ছে চসার বোকাচিয়োর সগোত্র কবি, যাঁরা ছন্দে লিখছেন কথাসাহিত্য, সৃষ্টি করছেন চরিত্র, বুঝেছেন মানুষের বৈচিত্র্য। এরূপ আধুনিকতার স্বাক্ষর পাই আরও প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষ

করে গ্রীক সাহিত্যে আর লাতিন সাহিত্যে। যে পরিমাণে সে সব লেখা এই মানবীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সে পরিমাণেই মনে হয় সে সব লেখা আমাদের স্বকালের, আধুনিক যুগের।

'সহজ মানুষ' ও মানবতাবাদ

কথা না বাড়িয়ে এই সূত্রেই আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখন বলতে পারি: সত্য বটে, মানুষ যখন থেকে নিজেকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে জেনেছে তখন থেকেই তার সৃষ্টিতে তার মানব-চেতনার সাক্ষ্য মিলবে; তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে মানুষ নিজের শক্তির বা মর্যাদার খবর বুঝে উঠতে প্রায়ই পারেনি। তা'ই প্রাচীন যুগে সে নিজেকে প্রায়ই দেখেছে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবে; জীবনের অর্থ তার কাছে অনেকাংশে গোচর হয়েছে দেবতার লীলা বলে। মোটামুটি আমাদের দেশের, এবং অন্য অধিকাংশ দেশেরও প্রাচীন সাহিত্যে তাই মানুষের কথা কীর্তিত হয়নি, হয়েছে দেবদেবীর কথা, ধর্মের কথা, পরলোকের কথা, অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা; এবং অবশেষে মানুষের নামেও কীর্তিত হয়েছে দেবতার (শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির) মাহাত্ম্য। এইটাই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ,—এখনো তার জের বহু সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়নি। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এ জিনিসই প্রচণ্ড রকমে দেখি—ভাগ্য-তাড়িত মানুষ দেবতার মুখ চেয়ে আছে।

রামায়ণ মহাভারতেও এই দেবলীলাকে মানবভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখি। অবশ্য আমাদের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে দেখি—সেই অস্ফুট মানবতাবোধের আরও সূক্ষ্মতর প্রকাশ। তবু বোঝা উচিত, চণ্ডীদাস বা সহজিয়াদের "মানুষ" সবার উপরে সত্য বটে, কিন্তু কি হিসাবে সে সত্য ? সমস্ত সুখদুঃখের অতীত মানুষ হিসাবে, সমাজ-সম্পর্কের অতীত সত্ত্বা হিসাবে। অর্থাৎ পরমাত্মার স্বাক্ষর-স্বরূপ মানবাত্মা বলে—নির্গুণ নির্বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব আত্মা হিসাবে। আধুনিক মানবতা-বাদ কিন্তু এমন "আধ্যাত্মিক" মানবতাবোধ নয়। আধুনিক মানুষের চোখে মানুষ সত্য মর-জগতের মানুষ হিসাবে, আত্মার প্রতীক হিসাবে নয়। মানবীয় সম্পর্কের অতীত হয়ে আধুনিক মানুষ সত্য নয়, মানবীয় সম্পর্কের জন্যই বরং মানুষ সত্য—সত্য হাসির জন্য, কান্নার জন্য ; সমাজ সম্পর্কের সমস্ত বাঁধন নিয়ে, সমস্ত বাঁধন মেনে—আর সমস্ত বাঁধন ছিঁড়েও,—কিন্তু বন্ধনমুক্ত বলে নয়। আধুনিক মানুষ সত্য secular জীবন নিয়ে, social মানুষ হিসাবে। আর চণ্ডীদাস বা মধ্যযুগের চোখে মানুষ সত্য—spiritual সত্ত্বা হিসাবে, divinityর প্রতীক হিসাবে। আজ এ যুগে মানুষের মহিমা যখন আমরা উপলব্ধি করছি, তখন তা'ই নতুন করে ব্যাখ্যা করছি চণ্ডীদাসের 'সহজ মানুষকে'। লক্ষ্য করা দরকার—ত্রিশ বছর আগেও বাঙলা দেশের সাহিত্যিকরা সহজিয়া চণ্ডীদাসের এই বাণী নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি. এরূপ.

ভাবে নতুন করে তা ব্যাখ্যা করার কথাও তাঁরা ভাবেননি। কারণ তখনো বাঙালীর চোখে মানুষ এত সত্য হয়ে ওঠেনি। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ পরিচয়, ১৩৫১)

গ্রীক্ মানবতাবাদ

আসলে কথাটা এই, প্রাচীন সাহিত্যে একটা মানবতাবোধ ছিল, কিন্তু এমন মানবতাবাদ ছিল না। তবে প্রাচীন কালের সেই মানবতাবোধই ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে এই মানবতাবাদে; ইতিহাসের এক এক স্তরে তা এক এক ভাবনায় ও লক্ষণে প্রভাবিত হয়ে এ ভাবে ক্রমশই স্পষ্টতর হয়েছে। সব চেয়ে আগে সম্ভবত গ্রীস দেশেই এই মানবতাবোধ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়েছিল। সে জন্যই গ্রীক্ সাহিত্যকে মনে হয় এত আধুনিক। তার কারণ, প্রাচীন গ্রীসের জীবন-যাত্রা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ অনেকটা বেশি উন্নত হয়েছিল। সেখানে দাস-পরিশ্রমের উপর বনিয়াদ করে ছোট ছোট শহরে পৌর-সভ্যতা, বহির্বাণিজ্য, গণতন্ত্র, এমন কি, কাঞ্চন-কৌলিন্য বা 'money economy'রও প্রায় প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল। অ্যাথেনস্ তো প্রায় একটা সাম্রাজ্যও স্থাপন করে ফেলেছিল। অর্থাৎ এক দিক্ থেকে দেখলে সেই গ্রীক্-সভ্যতার সামাজিক বনিয়াদ ছিল আধুনিক সভ্যতার "অণু-রূপ" (শুধু অনুরূপ নয়)।

(দ্রষ্টব্য : ইস্কাইলুস্ ও অ্যাথেন্স,—জর্জ টমসন্ রচিত) পরবর্তী মধ্যযুগে ইউরোপে তা মুছে গেছল, অন্য অনেক দেশে গ্রীসের মত সামাজিক বনিয়াদ স্থাপিতও হয়নি। সে জন্যই গ্রীক্ চিন্তায় আধুনিকতার বেশি পূর্বাভাস দেখি। আমরা জানি, সেই আভাসই পুনঃ-প্রস্ফুট হল ইউরোপে রিনাইসেন্সের সময়—যখন গ্রীক্ চিন্তা-জগৎ নতুন করে আবিষ্কৃত হল, আর মধ্যযুগের সভ্যতার ভূমিদাস-ভিত্তি কাটাবার জন্য স্থাপিত হচ্ছিল আধুনিক বণিক্-ধনিক্ যুগের বনিয়াদ—ইতালির শহরে-বন্দরে। (দ্রঃ Sociolcgy of Renaissance—Alfred von Martin ; এবং পরিচয়, ১৩৫১)। এবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বনিয়াদ আরও দৃঢ়তররূপে স্থাপত হল, আর সেই সুস্থির সামাজিক বনিয়াদ এবার লুপ্ত হল না। কারণ ক্রমেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার এসে তাকে পাকা করলে। এমন কি দেশ-বিদেশেও তারই নতুন সম্ভাবনা বিজ্ঞান এবার সুস্থির করে দিলে। এবং আরম্ভ হল 'আধুনিক কাল' রিনাইসেন্সের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে! রিনাই-সেন্সকে এ হিসাবেই বলি আধুনিক কালের প্রথম সোপান। নইলে চীন দেশে কনফুসীয় যুগ থেকে সুস্থ ঐহিক দৃষ্টিতেও সমাজবোধ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানত চীনা সমাজ ছিল পরিবার-কেন্দ্র—প্রাচীন সমাজ অনেকাংশে তা'ই থাকে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার (যেমন, বারুদ আর কাগজ, সব চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটায় যা ইউরোপের ইতিহাসে) চীনের সমাজে

বেশি দূর গড়াল না, সমাজের পুরনো কাঠামো ও মান্দারিন (scholastic) ঐতিহ্য এত অনড় হয়ে রইল যে, তার ফলে চীনে মানুষের মূল্য, ব্যক্তিত্বের ও গণতন্ত্রের স্ফুরণ বিশেষ হল না। চীনা সাহিত্য তাই রইল সুদূর নৈর্ব্যক্তিকতায় আবদ্ধ। এখন সবে তার সেই বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে, ল্যু স্যুন্-এর সঙ্গে—নতুন চীনের জন্মে।

রিনাইসেন্সের কাল থেকে যে মানবতাবাদ সমুত্থিত হল তা প্রাচীন যুগের মানবতা-বোধেরই ঐতিহাসিক পরিণতি। তবু তার সঙ্গে প্রাচীন মানবতাবোধের পার্থক্যও শুধু কালে, আয়ুতে, আর পরিমাণে নয়। বল্‌তে হবে সব শুদ্ধ এ পার্থক্য গুণগত। তখন থেকে মানুষ ও পৃথিবী হয়ে উঠল মানুষের সব চেয়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

How beauteous mankind is !
O brave new world ;
That has such people in't !

'আধ্যাত্মিকতার' দিন এভাবে ফুরোতে লাগল। তারপর আমেরিকায় ও ইউরোপে ঐতিহাসিক গতি এই মানবতাবাদকে আরও নতুন রূপ দিল সমাজে রাষ্ট্রে "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হল তার সর্বজন-স্বীকৃত ঘোষণা —যদিও এই বাণী আগেই রূপ নিচ্ছিল ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়। ১৭৮৯ এর পর থেকেই ব্যক্তিসত্তার দাবী স্বীকৃত হতে লাগ্‌ল,

স্বীকৃত হল গণতন্ত্রেরও দাবী। আধুনিক সাহিত্যেও তখন তার এই দ্বিতীয় সত্যকে আবিষ্কার করল, ব্যক্তিহিসাবে কত বিশিষ্ট আর বিচিত্র মানুষ, এবং Man's man for a' that। কিন্তু সেই মানবতাবাদ, সেই গণতন্ত্র আর ব্যক্তিসত্তাবোধও প্রশস্ত হয়ে হয়ে আবার ইতিহাসের নতুনতর বিকাশে আজ আর-এক নতুন সত্য ও চেতনাকেও মানুষের নিকট ক্রমশই স্পষ্ট করে তুলেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের জন্য চাই শোষণতন্ত্রের অবসান। এই বাণী ইতিহাসে রূপলাভ করেছে ১৯১৮-এর সোভিয়েতবিপ্লবে। তাতে করে আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের আর্থিক ও যথার্থ আধ্যাত্মিক বিকাশে এই নতুনতর সত্য—মানুষ বিপ্লবী-শক্তির অধিকারী, কারণ মানুষ সৃষ্টিধর্মী ;—সে গড়তে পারে আপনার জীবনকে আপনার প্রযত্নে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য

আধুনিক কালের এই মানবতার বাণী একই কালে সব দেশে সমভাবে স্ফূর্তিলাভ করেনি, তা স্পষ্ট। এখনো যে এ সব বাণীকে আমাদের দেশে আমরা কতটা ঘোলাটে চোখে দেখি, তাও স্পষ্ট। কিন্তু মানবতাবাদের বিকাশ যে সব সাহিত্যে ও সমাজে সমান ভাবে হয়নি তার কারণ এই—সব দেশে ইতিহাস সমভাবে সমতালে বিকাশ লাভ করেনি। এই তো দেখছি

আজ যখন সোভিয়েত দেশে মানুষ আপনার বিপ্লবী-নিয়তি সংবন্ধে সচেতন, ইংলণ্ড আমেরিকার মত দেশেও তখন পর্যন্ত মানুষ ভাব্‌ছে নিজেকে অনেকটা অসহায় বলে, অভিশপ্ত বলে ; আর আমাদের দেশে আমরাও ভাব্‌ছি তদনুরূপ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা, সমাজ বিকাশের এক স্তর নিচে দাঁড়িয়ে, ধনিক্‌তন্ত্রী সংকটে তাদের চেতনা দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা অবশ্য আরও নিম্নে, আরও জটিলতর এক অবস্থায়। একই কালে সাম্রাজ্যবাদী আওতায় প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের বোঝা আমাদের ঘাড়ে, ধনিকতন্ত্রী আশা ও চেষ্টার তাড়নাও আছে ; আর সমাজতন্ত্রী চিন্তা ও চেতনার স্বপ্নেও আমরা এখনি আকুল হই। আমরা জাতীয়-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাই। পরাধীনতা, শাসন ও শাস্ত্রাধীনতাকেই জাতীয় ঐতিহ্য মনে করে বসি। তাই কখনো এই নানা তরঙ্গে ভেসে আমরা খাপ্‌ছাড়া ভাবে উল্লসিত হচ্ছি, কখনো হচ্ছি উৎকট নিরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত। এই অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের সুরকে ছাপিয়ে আধুনিকতার সুরও এসেছে এক অসাধারণ তীব্র আবেগে। প্রথম তা দেখা দিল যখন মধুসূদন-বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যের নতুন দ্বার খুলে দিলেন। দু'জনেই আধুনিক সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী। সাহিত্যে পরমার্থ ছেড়ে তাঁরা ঐহিক জীবনকে আশ্রয় করেন, দেবতা ছেড়ে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেন। অমনি আমাদের চেতনায় এই ফরাসী 'মানব অধিকার'-

বোধ তীব্র আবেগে দুকূল ছাপিয়ে ব'য়ে গেল—অথচ আমাদের জীবনে আমরা এখনো তার অনুরূপ সুস্থ খাদ রচনা করতে পারিনি—সাম্রাজ্যবাদের তাড়না আমাদের সে মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠার মত সুস্থির অবকাশ দেয়নি। কাজেই একটা সুস্থ স্থির বিকাশের দিকে আমাদের সাহিত্য এগিয়েও এগোতে পারছে না।

১৮৬০ থেকে ১৯৭০, এই আশী বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙলা সাহিত্যে অদ্ভুত তীব্রগতিতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছি প্রায় চারশ' বৎসরের 'আধুনিক যুগের' ইউরোপীয় সাহিত্যের নানা স্তরকে। অথচ জীবনে আমরা এখনো বাঁধা নানা পুরনো ব্যবস্থার ও আধুনিক অব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে। আমাদের এ চেষ্টা যত তালহারা হোক, তা বিস্ময়াবহ। মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্য আমরা যেমন তীব্র বাণীতে বল্‌তে পেরেছি আমাদের এই আধুনিক আশী বছরেব সাহিত্যে তা সত্যই অপূর্ব, কেউ তা স্বীকার না করে পারবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা আমরা সম্পূর্ণ স্থাপিত করতে পারি না, মানুষের স্বীকৃতি আমাদের সাহিত্যে তাই অব্যাহত হয় নি, তাও সত্য।

মানুষের "বিপ্লবী-নিয়তি" আমাদের সাহিত্যে এখনো বাণী-রূপ গ্রহণ করেনি, একথা তাই বলাই বাহুল্য। ইউরোপের বহু সাহিত্যে ও তার স্বাক্ষর এখনো ঝাপ্‌সা। তার সুস্পষ্ট চেতনা শুধু সোভিয়েত জীবনেই এখনো ফুটেছে; এবং ফুটছে তা'ই

কতকটা তালকানা ভাবে সোভিয়েত সাহিত্যেও। কিন্তু একটা কথা আছে। ইউরোপের অনেক অতি-স্থির জাতির থেকেও (যেমন, ইংরেজ) বিপ্লবী ব্যাকুলতা আমাদের জীবনে বেশি উগ্র ও উত্তাল হবার সম্ভাবনা। তাই, এ কথা অসম্ভব নয়—অদূর ভবিষ্যতে—আমাদের সাহিত্যে একই কালে মানব সাম্যের ও মানুষের বিপ্লবা-নিয়তির বাণী প্রস্ফুট হয়ে উঠতে পারে—মানব-প্রগতির সমস্ত পথটিই আলোকিত হয়ে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে হয়ত এক বিপ্লবী জাগরণে। অন্তত মানুষ ও মানব-সত্য যে ক্রমেই সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করবে, তা নিঃসন্দেহ।

কারণ, যা'ই হোক ভবিষ্যৎ, এ কথা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি—আধুনিক সাহিত্যের "আধুনিকতার" অর্থ কি, কি তার মূল বাণী। ইতিহাসের তিনটি বড় রকমের সমুত্থানের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার এই ক্রম-বিকাশকেও আমরা চিহ্নিত করতে পারিঃ—ইউরোপীয় রিনাইসেন্সে উদ্বোধন ঘটেছে মানুষের মহিমা বোধের, ফরাসী-বিপ্লবে ঘটেছে "মানুষের অধিকারের" ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা; আর সোভিয়েত বিপ্লবে ঘটেছে মানুষের বিপ্লবী যাত্রার সূচনা। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মানুষের এই স্বীকৃতি, এই মানব-সত্য, ব্যক্তিমহিমার ও জাতীয় স্বাধীনতার বাণীরূপে কতটা প্রকাশ লাভ করেছে, তা একটা মূল প্রশ্ন।

১৩৫৩

বাঙলা সাহিত্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা

পৃথিবীতে সাম্রাজ্য অতি পুরাতন জিনিস, কিন্তু 'সাম্রাজ্যবাদ' জিনিসটি তেমনি অত্যন্ত নতুন। কারণ, 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে আমরা পুরাতন কালের সম্রাটদের শাসন-ও-শোষণ ব্যবস্থা বুঝি না। এ-কালের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্তিমকালীন শাসন-ও-শোষণ ব্যবস্থাকেই আমরা বলি 'সাম্রাজ্যবাদ'। 'সাম্রাজ্যবাদ' হল পুঁজিবাদেরই শেষ পর্ব, লেনিনের এই যুগান্তকারী বিশ্লেষণ সকলেই মেনে নিয়েছেন। দুই দুইটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা সাধারণ মানুষের নিকটেও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ; যেমন, পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধ সাম্রাজ্য বাদী স্তরে নগ্নরূপ ধারণ করে। প্রথমত দেখি—সাম্রজ্যবাদীদের পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত, সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম তাতে আজ চির-ঘনায়িত। যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে ততক্ষণ স্থায়ী শান্তি স্থাপন পৃথিবীতে সুকঠিন। দ্বিতীয় কথা এই, যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে ততক্ষণ সাম্রাজ্য-কবলিত পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উৎপাদন-শক্তিও খর্বিত থাকতে বাধ্য। এ-সব জাতির আর্থিক, রাজনৈতিকও সাংস্কৃতিক সকল দিকের প্রগতিই সাম্রাজ্যবাদের শাসনে, শোষণে ও সাংস্কৃতিক চাপে পঙ্গু হয়ে থাকে। সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতিসমূহের জাতীয় বিক্ষোভ এবং

অভ্যুত্থানও তাই অনিবার্য : পরাধীন জাতির আত্মপ্রকাশের আসল পথ হল তার মুক্তি সংগ্রামের পথ। তাই পরাধীন জাতির সংস্কৃতির প্রধান প্রেরণা জোগায় তার স্বাধীনতার প্রেরণা। তথাপি এই স্বাধীনতাহীন জাতির সাধারণ কার্যে ও কল্পনায় সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত ছায়া নানাভাবে পতিত হয়। অন্যদিকে সেই স্বাধীনতা-কামী জাতির প্রত্যকটি শ্রেষ্ঠ কীর্তিতে, বিশেষ করে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পে ও সাহিত্যে, ছাপ পড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-চেতনার। শুধু তাই নয়, সেখানেও স্বাধীনতা ও পরাধীতার সূক্ষ্ম-স্থূল দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। পরাধীন জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্য যেমন এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তেমনি সেই শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যও আবার তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংকল্পের এক প্রধান উৎস।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যও এই সত্যেরই এক জীবন্ত স্বাক্ষর।

ঔপনিবেশিকতার অসঙ্গতি

'কলোনির রিনাইসেন্স' : আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের সূচনা-কালকে (মোটের উপর ১৮৪০-১৮৯০ ইং) আমরা বলি 'বাঙালীর রিনাইসেন্স'। কিন্তু এই মূল কথাটি আক্ষরিকভাবে বা স্থূল অর্থে গ্রহণ করা চলবে না। আরও কয়েকটি ছোট বড় কথা মনে রেখে তবেই এই সত্য অঙ্গীকার করতে হয়। যেমন, গোড়ার কথাটা বিস্মৃত হবার নয় যে, সত্যই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বা

বাঙালীর আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনের সূচনা হয় উনিশ শতকের "বাঙালী রিনাইসেন্স' বা বাঙলার "নবযুগের" পত্তনে। এবং এই 'রিনাইসেন্সে'-এর বাহক ও বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টারা ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী—অর্থাৎ 'হিন্দু-ভদ্রলোক'। এ-দুটি কারণ নিঃসম্পর্কিত নয়, কিন্তু এ-দুটি কারণের ফলে আধুনিক বাঙালীর জীবনে, শিল্পে, সাহিত্যে নানা অসঙ্গতি ও দুর্বলতা গোড়া থেকেই থেকে গিয়েছে।

কারণ, বাঙলার 'রিনাইসেন্স' ছিল 'কলোনিয়াল রিনাইসেন্স', —পরাধীন জাতির রিনাইসেন্স। এবং যে স্বাধীন নয় তার সত্য-কার রিনাইসেন্স হবে কি করে? বাঙালী সমাজের বিকাশে বা বিপ্লবে আমাদের সেই রিনাইসেন্স উদ্ভূত হয় নি। বরং বিজয়ী শাসকবর্গের সংস্পর্শে এসে, বিজয়ী সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার তাড়নায় পরাজিত ভগ্নোন্মুখ বাঙালী সমাজ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ-বণিকের রাজত্বে বাস্তব ক্ষেত্রে এ-জাতির বিকাশ তখন অবরুদ্ধ; শিল্প-বাণিজ্যে ও বৈষয়িক উদ্যোগে তার বিকাশের কোন সুযোগ নেই। অথচ ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষায় ধনিক-সভ্যতার বিরাট রূপ দেখে বাঙলী তার প্রেরণায় পাগল হয়ে উঠল। 'কলোনিয়াল রিনাইসেন্সের' দুর্গতি এমনিতর—তার বাস্তব ভিত্তি সামান্য, অথচ মানস-প্রয়াস আকাশস্পর্শী। তার সৃষ্টিও তা'ই কতকটা আকাশ-চারী; বাস্তব-বিমুখ, গণতান্ত্রিক প্রেরণায়, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে ও চিন্তায় দুর্বল।

মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা

এ-দুর্বলতা আরও জটিলতর হয় এজন্য যে, বাঙালী রিনাই-সেন্সের বাহকেরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাঁরা হয় জমির মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদার, নয় যাঁরা ইংরেজি শিক্ষাকে মুখ্যত গ্রহণ করেন ইংরেজ শাসনযন্ত্রের ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে স্থানলাভ করে সৌভাগ্যবান হবেন বলে। সমাজতত্ত্বজ্ঞরা জানেন—একেই শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তের কোনো ভিত্তি-কেন্দ্র নেই। তার উপরে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত দোকানী-পশারীরা, ব্যবসায়ে বিমুখ ছিলেন, জীবিকাক্ষেত্রে নিতান্তই তারা চাক্‌রে বা কেরানী হলেন। এ-দেশীয় রাজা, জমিদার প্রভৃতির মতো ইংরেজ এই মধ্যবিত্ত-দেরও নিজেদের শাসনের একটি বাহনে পরিণত করতে চেয়েছিল, এঁরাও ইংরেজের তল্পিদারি করতে লজ্জা পান নি। শ্রেণী হিসাবে তাঁরাও ছিলেন ইংরেজের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার আস্বাদন-লাভ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা অনেকেই হয়ে উঠলেন স্বাধীনতার অগ্রদূত। শোষিত জনগণের মুক্তি-চেতনার সেদিন তাঁরাই প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধের এও একটা দিক। শ্রেণীগত ভাবে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার তাঁদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হলেন সাম্রাজবাদের এই প্রতিবাদীরা। কিন্তু ঠিক এই কারণেই এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিবাদেরও মধ্যে আবার অন্তর্নিহিত রইল অনেক অসঙ্গতি। যেমন, শ্রেণী হিসাবে যাঁরা ইংরেজের

মুখাপেক্ষী, এবং জমিদারি-প্রধান ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, তাঁদের পক্ষে স্বাধীনতার তাগিদেও তখন সম্ভব হল না দেশের জনসাধারণের সঙ্গে একত্র হয়ে দাঁড়ানো, ইংরেজ-রাজের শোষণে উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ কৃষক-শ্রেণীর সংগ্রামে যোগদান করা, কোনো ব্যাপক জাতীয় মোরচা বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠন করা। বরং একদিকে যেমন তাঁদের সৃষ্টিতে স্বাধীনতার তীব্র প্রেরণা দেখা যায়, অন্যদিকে দেখা যায় জনসাধারণের জীবন থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা। এজন্যই তাঁদের কথা ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র মেলে কলোনির কেরানী চরিত্রের দুর্বলতা,—দ্বিধা, কুণ্ঠা, সাহসের শোচনীয় দৈন্য।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছাপও কম নয়; 'ঔপনিবেশিক রিনাইসেন্সের' মতোই 'ঔপনিবেশিক সাহিত্যে'ও এ-কলঙ্কস্পর্শ থেকে যায়।

'লিবারলে'র মোহ

এই মূলকথা ছাড়া আরও কয়েকটি কথাও এ-সময়কার সমাজ ও সাহিত্যের বিশ্লেষণে স্মরণীয়। যেমন, ব্রিটিশ পুঁজিবাদ সত্যই 'সাম্রাজ্যবাদে' পরিণত হয় প্রায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে; যদিও ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে আসে ১৮০০-এর দিকেই। উনিশ শতকের প্রথম দু'তিন পাদ পর্যন্ত তবু ধনিক-সভ্যতার সম্প্রসারণের যুগ। তাই সে সভ্যতার পতন কিংবা তার চরম অধোগতি তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে অকল্পনীয়

ছিল। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে তাঁরা বরং ভাবতে শিখেছিলেন যে, ব্রিটিশী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (পার্লামেণ্টারি ডিমোক্র্যাসি), ব্রিটিশী সমাজ-ব্যবস্থা (ধনিক-আভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্ব) ব্রিটিশী আইন-কানুন (রুল্ অব্ ল), সভ্যতা-সাহিত্যই পৃথিবীর চরম সৃষ্টি। এমন কি, ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় তার পদাঙ্ক অনুসরণেই ভারতবাসীরও মোক্ষ। বলা বাহুল্য, এ 'বুর্জোয়া লিবারল' বিভ্রান্তি আজ এই সাম্রাজ্যবাদী সংকটের যুগেও (১৯৫২তেও) ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল রয়েছে। তাহলে, উনিশ শতকে—'সাম্রাজ্যবাদের' স্বরূপ যখনো প্রকটিত হয় নি—তখনকার ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ সভ্যতা, ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও ব্রিটিশ শাসন-শক্তির প্রতি মিথ্যা মোহ থাকা মোটেই বিস্ময়কর কিছু ছিল না। আর এই মোহের জন্যই তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাও অনেকক্ষেত্রে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয় নি। অনেকক্ষেত্রেই স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল শুধু সংস্কারপন্থী। সাধারণভাবে দেখা যাবে তা যতটা সামন্ত-তান্ত্রিক ভাবনা ও রীতিনীতির ("কুসংস্কারের") বিরোধী, ততটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নয়। এমন কি, কখনো কখনো 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বলে জন-শক্তির প্রতি যতটা তাঁরা বিমুখ, দেশীয় সামন্ত-শক্তির প্রতি ততটা বিমুখও নন (প্রমাণ কেশবচন্দ্র)। কিংবা একই কালে যেমন তাঁরা কেউ কেউ জন-শক্তির অনুকূল, তেমনি আবার সামন্ততন্ত্রেরও অনুগত। অর্থাৎ, 'কলোনির লিবারলের' মধ্যে চিন্তার প্রচুর অসঙ্গতি ছিল।

'জাতীয়তাবাদের' মোহ

ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশী বুর্জোয়া-শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এইরূপ বিচিত্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পরাজয়ের ক্ষোভে অনেকের জাতীয় মর্যাদাবোধ এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে জাতীয় প্রতিরোধ রচনায় ব্রতী হন—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। তাঁদের জাতীয় মর্যাদাবোধ স্বভাবতই প্রাচীন ভারতের জীবন, আদর্শ, জাতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে আঁকড়িয়ে ধরে এবং তাঁরা সবলে প্রত্যাখান করতে চান বিজেতার শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতিকে। অর্থাৎ, এই 'জাতীয়তাবাদী' বা 'রক্ষণশীল' প্রয়াসের বাস্তবপক্ষে অর্থ দাঁড়ায় স্বাজাত্যের নামে সামন্ত-যুগের অচল সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতিকে সমর্থন করা, এবং বিজাতীয় ও বিজেতার জিনিস বলে জীবন্ত:বুর্জোয়া সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করা। এদের সৃষ্টিতে তাই একই কালে যেমন দেখা যায় তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, তেমনি দেখা যায় হিন্দুত্ব, হিন্দু জাতীয়তা ও সামন্ত-সংস্কৃতির প্রতি মোহ। এঁরা বুঝেও বুঝতে চাইলেন না—এই পুরাতনের প্রতি মোহ মূলত জাতীয় মুক্তির, ও জাতীয় আত্মবিকাশেরই পরিপন্থী।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের এই স্ববিরোধী মতাদর্শ বিশ্লেষণ করার সময়ে আর একটি স্থূল, সাধারণ কথাও বিবেচনা করতে হবে। সেদিন মতাদর্শ স্পষ্ট করে স্থাপন করার পক্ষে বাস্তব

বাধা ছিল। বিদেশী রাজা সেদিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কেন, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কথাও বরদাস্ত করত না। তাই 'রাজভক্তির' প্রকাশই ছিল তখন ধরা-বাঁধা নিয়ম। তা কতকটা ছিল সামন্ততন্ত্রের ঐতিহ্যগত, কতকটা প্রয়োজনীয় কৌশল। সেদিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাই আশ্রয় করত ইতিহাসের বা পুরাণের কোনো কাহিনী। এজন্য টডের রাজস্থানের কল্যাণে স্বভাবতই রাজপুত বীরত্বগাথা বাঙলা সাহিত্যের একটা প্রধান বিষয় হয়। এই সব কাহিনীর কথাবস্তু যদিও প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রাম, মোগল বা পাঠান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিন্দু সামন্তশক্তির প্রতিরোধ, বাঙালীর লেখার ভাববস্তু আসলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আক্রান্তের আত্মরক্ষা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের প্রতিরোধ, বিজাতীয় বিজয়ীর বিরুদ্ধে দেশের জনতার বা সামন্ত জন-নেতার বিদ্রোহ। 'আনন্দমঠের' বাইরের সাফাই কি সম্পূর্ণ সত্য? এ-সব লেখার ক্ষেত্রে বিচার করা প্রয়োজন—কোন্ লেখার উদ্দেশ্য কী, এবং ফলাফলই বা কী? কারণ, অনেক সময়ে উদ্দেশ্য হয়তো এক, ফলাফল দাঁড়ায় অন্যরূপ। অন্তত, বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ এরূপ অনেক লেখায় সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ বোধ করেছেন। অনভিপ্রেত হলেও কোনো কোনো স্বাধীনতাকামী সাহিত্যিক এ-ভাবে সাম্রাজ্য-বাদের ভেদনীতিরও উপাদান জুগিয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র

তা ছাড়া, সাহিত্যের বিচারে বা বিশ্লেষণে কেউ সরাসরি সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিলিপি সাহিত্যে খুঁজতে গেলে নিরাশ হবেন। সাহিত্যের কোনো কোনো শাখায় অবশ্য তা দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন উপন্যাসে, নাটকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতায়। কিন্তু অন্য কবিতায়, বিশেষতঃ গীতিকবিতায় তা দুষ্প্রাপ্য হবার কথা। আবার, কবিতায় স্বাধীনতার প্রেরণার ছাপ যতটা সহজে পড়ে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ছাপ ততটা সহজে পড়তে পারে না। তা ছাড়া, সর্বদাই মনে রাখা দরকার —সাহিত্য কোনো একটি সমাজ-ব্যবস্থার শুধু ফটোগ্রাফ নয়, সে সমাজ-সত্যকে মুকুরিত করে—সাহিত্যেরই নিয়মে। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক, গৃহভিত্তির সঙ্গে গৃহের উধ্ব'-শালার সম্পর্ক, অপরিহার্য হলেও যেমন পরোক্ষ, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-সত্যের সম্পর্কও তেমনি পরোক্ষ। সার্থক সৃষ্টিতে তো তা প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। আক্ষরিক (mechanistic) মনোভাব নিয়ে যাঁরা সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক সত্য অন্বেষণ করেন তাঁরা সাহিত্যের সত্যকে বিসর্জন দিয়ে সমাজ-বৈজ্ঞানিকের সত্যকেই চান। তাঁদের নিকট আধুনিক বাঙলা সাহিত্যকে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারের সাহিত্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতারই স্বাক্ষর বলে মনে হতে পারে।

স্বাধীনতার সাক্ষ্য

বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় মনোভাব যাঁদের পেয়ে বসবে, তাঁদের হাতে 'প্রমাণের' অভাব হবে না, উপরের কথাগুলো মনে রাখলেই আমরা তা বুঝতে পারি। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতায় অসঙ্গতি অন্তর্নিহিত থাকে,—সাম্রাজ্যবাদী পর্বে সে অসঙ্গতি আরও স্পষ্ট হয়। তাহলে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের (পেটি-বুর্জোয়ার) জীবনে, চিন্তায়, সমাজে, সভ্যতায় যে অসঙ্গতি পদে পদে থাকবে তা বোঝা যায়। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও তাই কেউ এ সাহিত্যের কোনো একটি স্তরে—এমন কি কোনো একজন সাহিত্যিকেরও লেখায়—পূর্বাপর একটানা নিছক, নির্দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বা প্রগতিবাদিতা পাবেন কি না সন্দেহ। প্রত্যেকেরই মধ্যে রয়েছে সেই মৌলিক স্ববিরোধিতার ফল হিসাবে প্রচুর অসঙ্গতি। কিন্তু এ সত্ত্বেও, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সোয়া শত বৎসরের বাঙলা সাহিত্য পাঠে বাঙালীর মনে মোটের উপর কোন্ ভাবনা দৃঢ় হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, না, সাম্রাজ্যবাদের স্বীকৃতি? যে কোনো বাঙালীই এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর দেবেন—সে উত্তর তর্ক সাপেক্ষ নয়, সে উত্তর অখণ্ডনীয়।

প্রথম পর্ব ঃ উদ্বোধন

রামমোহনকে (১৭৭২-১৮৩৩) বলা হয় বাঙলার আধুনিক

যুগের আদি পুরুষ, 'Morning Star of Indian Renaissance', ভারতীয় জীবন-প্রভাতের পূর্বাভাস। অবশ্য রামমোহন একা ছিলেন না ; সে যুগে আরও প্রতিভাবান্ বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রধানত, তিনি চাইলেন সামন্ততান্ত্রিক আচার, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিও ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা। তিনি ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা দেখে পাগল হন, বিলাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের (রিফর্ম বিলের) সম্বন্ধে বলিষ্ঠ মত পোষণ করেন ; নেপল্‌স্, আয়র্লণ্ড ও স্পেনের উপনিবেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহ বোধ করেন, নিজেও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণে ক্ষুব্ধ হন। অসাধারণ কর্মী ও যুক্তিবাদী পুরুষ রামমোহন ; কিন্তু তথাপি তিনি সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দণ্ডায়মান হন নি ; এমন কি এদেশে ব্রিটিশের উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাবও তিনি অনুমোদন করতেন। অর্থাৎ এই যুগপুরুষের চরিত্রও যুগের অসঙ্গতি থেকে মুক্ত নয়। অথচ রামমোহনের মানব-অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনায়, তাঁর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধায়, এবং তাঁর নানারূপ বুর্জোয়া শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচারের চেষ্টায়, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠায় এ-দেশে নবযুগের উদয়াভাস পাওয়া যায়, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব রূপ তখনো (১৮১৫-১৮৩০) অজ্ঞাত। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যিনি 'মানুষের

অধিকারের' বাণী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখনকার দিনে তাঁকেই তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলে গণ্য করতে হবে। রামমোহন তারই প্রতীক।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ আরম্ভ হল অবশ্য শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। তার পূর্বে হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগ, সাহিত্যসৃষ্টির যুগ না হলেও তা সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি-প্রচেষ্টার যুগ। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সেদিক থেকে রামমোহন অপেক্ষাও বুর্জোয়া আদর্শে অধিকতর উদ্বুদ্ধ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে লেখেন সাহিত্য। সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তিনিই পূর্বযুগের শেষে কবি। বাঙলায় প্রথম স্বদেশপ্রেমের কবিতা লেখেন এই গুপ্ত কবি ;—ইংরেজিতে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে প্রথম কবিতা লেখেন ডিরোজিও ॥ 'তপসে মাছ' প্রভৃতি, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয়কেও গুপ্ত কবি অপাংক্তেয় রাখেন নি, তাও লক্ষণীয়। তাঁর মধ্যেই প্রথম দেখা যায় বিদ্রূপচ্ছলে শাসক হিসাবে ব্রিটিশের বিরোধিতা —যেমন, নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ করে লেখা—

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো…

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্বঃ নবযুগের সাহিত্য

কিন্তু নতুন বাঙলা কবিতা কথা কইতে আরম্ভ করল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এ-প্রশ্ন নিয়ে—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?

এই হল নতুন বাঙলা সাহিতের মূল সুর—আর এই সুর ও এই ধ্বনি আমরা শুনলাম ১৮৫৮-তে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন যখনো নেভে নি।

এর পরে বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের জোয়ার।

টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮, প্রথম উপন্যাস)-এ যুগের চেতনা আছে, কিন্তু নেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুশিক্ষাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৫৯-এ লিখিত হল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ"—স্পষ্ট করে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাও নয়, অত্যাচারী নীলকরের বিরুদ্ধে তা প্রতিবাদ। কিন্তু তার মধ্যে যে বিদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধূমায়িত তা রাজশক্তিরও বুঝতে বেগ পেতে হয় নি, দীনবন্ধুর পাঠকদেরও তা অগোচর ছিল না। "নীলদর্পণে" লেখকের নাম নেই, সরকারী চাকুরে দীনবন্ধু নিজ নাম প্রকাশ করেন নি। অনুবাদেও অনুবাদক মাইকেলের নাম রইল না। অনুবাদের প্রকাশক হিসাবেই তবু পাদ্রী লং সাহেব দণ্ডপ্রাপ্ত হন। "নীলদর্পণের" প্রতিবাদ যে বিদ্রোহের সুরে বাঁধা শাসকদের

তাতে সন্দেহ ছিল না। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"—তাতে বাঙলা সাহিত্যে দেখি ব্যঙ্গোক্তির আড়ালে সর্বপ্রথম সিপাহী-বিদ্রোহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। তাহলে কি সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যে সিপাহী-বিদ্রোহের সম্বন্ধে এই দৃষ্টি শিক্ষিত সমাজের অন্যত্রও তখন আত্মগোপন করে ছিল? 'হুতোমের' স্রষ্টা মাইকেলকে (১৮২৪-১৮৭৩) 'মেঘনাদ-বধ কাব্যের' (১৮৬১-১৮৬২) জন্য ঠিক এই সময়ই পুরস্কৃত করেন; সেই 'মেঘনাদ-বধের' বিদ্রোহের সুরটির মধ্যে এই সিপাহীর-বিদ্রোহের সুরটিও কি গোপনে গোপনে মিশে যায়নি? অবশ্য, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মধুসূদনের আবাল্য বিদ্রোহই তাঁর 'মেঘনাদ-বধের' মধ্যে মূর্ত হয়েছে। বিদ্রোহী রাবণের বিদ্রোহী পুত্রকে তিনি আপন নায়করূপে গ্রহণ করেন—সমস্ত নবযুগের বিদ্রোহের প্রতীক করে তোলেন।

মধুসূদন ও বঙ্কিম আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক। তাঁদের হাতেই বাঙলা সাহিত্যের নতুন দীক্ষা। এ দীক্ষা কিসের দীক্ষা? সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মপ্রকাশের, জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় স্বাধীনতার, 'মানুষের অধিকার' স্বীকৃতির, মানবসত্তার নতুন দাবীর, আর তাই, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের।

মধুসূদনের বিদ্রোহ

একদিকে মধুসূদনের মধ্যে এ-বিদ্রোহ যত উজ্জ্বল, বঙ্কিমের মধ্যে এই বিদ্রোহ ততই জটিল। মধুসূদন রাজনীতি নিয়ে সাহিত্যে বাহ্যত মাথা ঘামান নি, কিন্তু মধুসূদন ছিলেন সত্যকার রিনাইসেন্সের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ, Flower of Bengali Renaissance. সামন্ত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহই সর্বাপেক্ষা দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন। যিনি সামন্তযুগের জড় ছাড়িয়ে মানুষের অধিকারের যুগের সূচনা করেন, তিনি যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহেরই গোড়াপত্তন করেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামন্ত যুগের অবতার রাম ; তাই মধুসূদনের মানসলোকে তিনি গ্রাহ্য নন, বরং শ্রদ্ধেয় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রাবণ ও মেঘনাদ—তাঁরা অন্যায়কারী, দুষ্কৃতকারী বলে নয়, আক্রান্ত বলে, স্বর্ণলঙ্কার পেট্রিয়ট বলে, সর্বোপরি অচল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে—এ-কথা যদি তখনকার শিক্ষিত বাঙালী পাঠক না বুঝতেন তাহলে কিছুতেই অবতার রামচন্দ্রের সেই শত্রুপক্ষের এই গৌরবোজ্জ্বল চিত্র তাঁরা পরিপাক করতে পারতেন না। এমনি, মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা কাব্য" অভ্রান্ত সাক্ষ্য নারী-স্বাধীনতার ও নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বপক্ষে। অবশ্য, তাঁর "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" বা "একেই কি বলে সভ্যতা"ও প্রহসন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। একটি প্রাচীনদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ, আর একটি মধুসূদনেরই সহযোগীদের বিদ্রোহ-বিকৃতির ব্যঙ্গ-

চিত্র। রিনাইসেন্সি চেতনা কোনো অনাচারকেই ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। কিন্তু মধুসূদনের আসল পরিচয়—"মেঘনাদ-বধ কাব্য" ও "বীরাঙ্গনা কাব্য"—

"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি—"

আর যাতে সূক্ষ্মভাবে জাতীয় জাগরণের ভিত্তি রচনা করা হয়েছে।

বঙ্কিমের স্ববিরোধ

বঙ্কিম কিন্তু বাঙলা সাহিত্য ও সমাজকে প্রত্যক্ষভাবেই প্রভাবিত করেছেন। বঙ্কিম সামাজিক চেতনায় আলোড়িত, অনেক বেশি সংহত, বলিষ্ঠ পুরুষকার; তাঁর দান অনেক বেশি জটিল, আর অনেকখানি জটিলতাও তাই বাঙালীর জীবন-সাধনায় তিনি সৃষ্টি করেছেন।

প্রথমত, বঙ্কিম চরিত্র-চিত্রণে দক্ষ অসামান্য ঔপন্যাসিক। উপন্যাস যিনি সৃষ্টি করেন তিনি মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপ, তার অন্তর-বৈচিত্র্য ও জীবন-গতির সাক্ষ্যই বহন করেন। কারণ, যাকে আমরা 'মানব-সত্য' বলি, উপন্যাস তা স্বীকার করেই জন্মলাভ করেছে। এক কথায়, বঙ্কিমও সামন্ততন্ত্রের ধরাবাঁধা 'প্রমাণ-সাইজ' মানুষ ও ফ্রেমে বাঁধা সমাজকে মানেন না;

সত্যকার উপন্যাস সেরূপ সমাজ ভাঙতেই সহায়তা করে। বঙ্কিমও ঔপন্যাসিক হিসাবে তা করেছেন।

কিন্তু বঙ্কিম পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মেছেন; ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ হিসাবে তিনি বিজেতার ও বিজাতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে জাত্যভিমানে উদ্বুদ্ধ প্রবল পেট্রিয়ট্। তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা হয়ে দাঁড়ায় সেই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনা। সেই জাত্যভিমানের বশেই তিনি প্রমাণ করতে বসেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির অমরতা ও গৌরব। এই ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদের বশেই সামন্তবাদের প্রচলিত কাঠামোকেও তিনি যথাশক্তি অটুট রাখতে চান—তাঁর উপন্যাসেও তার প্রমাণ অজস্র। অথচ তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে, প্রেমের স্বাধীনতার বর্ণনায়, মানব-হৃদয়ের বিচিত্র গতিশীলতার চিত্রে তিনি সেই স্থবির কাঠামোকেই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।

কিন্তু বঙ্কিমের জাত্যভিমান শুধু সংকীর্ণতার পরিপোষক নয়, 'বঙ্গদর্শনে' তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবেশনে বদ্ধপরিকর; তিনি বুঝেছিলেন আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য দুর্দশা দূর করতে হলে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে আত্মসাৎ করতে হবে। —তিনি তাই সেদিনকার সর্বোন্নত বুর্জোয়া চিন্তা ও সংস্কৃতির আদর্শকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার, কোঁৎকে তিনি স্বীকার ক'রে তাঁর "অনুশীলন" ও "ধর্মতত্ত্ব" ব্যাখ্যা করলেন। সামন্ততন্ত্রের যে বিধি-বিধান ও মতবাদ এই

আধুনিক মতাদর্শে টেঁকে না, বঙ্কিম তাকে মিথ্যা বা গৌণ বলে বর্জন করতেও চান। অর্থাৎ, জাত্যভিমানবশে রক্ষণশীল, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল হতে গেলেও বঙ্কিম মিল-কোঁৎ-স্পেন্‌সারের মতাদর্শের মাপে তাঁর স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে শোধন ও সংস্কার করে নিতে প্রয়াসী। ঘটনা-গতির সঙ্গে ও বয়সের বৃদ্ধিতে তাঁর রক্ষণশীলতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তিনি "সাম্য" আর প্রকাশ করলেন না; কৃষকের সংগ্রাম সম্বন্ধেও বিরূপ হন; মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার আইনও সমর্থন করেন। তথাপি, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' তিনি পুরোধা। তাঁর লেখায় কিন্তু বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বিদূরিত হল না—এজন্য তিনিও কম দায়ী নন। বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তি তাই কাঁচাই রয়ে গেল। এসব কারণে বঙ্কিম বাঙালী রিনাইসেন্সর অসঙ্গতির প্রধান প্রমাণ, তাঁর বিভ্রান্তিরও এক শোচনীয় প্রতিলিপি।

কিন্তু এই অসঙ্গতি, এই রক্ষণশীলতা, ভ্রান্ত জাত্যভিমান সত্ত্বেও কথা-শিল্পী বঙ্কিম বাঙলায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত; মানব-সত্যের এক প্রধান মুখপাত্র। "কমলাকান্তের" বঙ্কিম পরাধীনতার মর্মজ্বালার উদ্‌গাতা; বৃটিশ শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 'মুচিরাম গুড়ের' স্রষ্টা ডেপুটি বঙ্কিমের ছত্রে ছত্রে। এবং "আনন্দমঠের" বঙ্কিমকে বাঙলার শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণার গুরু বলে যে

স্বীকার করেন, তা কতকাংশে তাঁদের মধ্যবিত্ত মোহ হলেও নিতান্ত অমূলক নয়। ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রই উচ্চারণ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন এ-দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরা—বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে এত বড় শ্লাঘার কথা আর কী হতে পারে ?

তৃতীয় পর্ব ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশ

মধুসূদন ও বঙ্কিমের পরে বাঙলা সাহিত্যের রাজপথ মুক্ত হয়ে যায়—সমস্ত অসঙ্গতিশুদ্ধ এগিয়ে চলে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সাধনা। কখনো তা স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট। কখনো পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর আবরণে, কখনো সংস্কার-পন্থী সাবধানতার সঙ্গে প্রবল হতে থাকে এই মুক্তিসাধনা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা। কালগতিতে যতই সাম্রাজ্যবাদের স্বভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে (১৮৭০ ও লিটনের আমলেই তা এ-দেশে প্রকটিত হয়), ততই লিবার্ল-সংস্কারবাদীদের মোহভঙ্গও ঘটতে থাকে ; আর অন্য-দিকে জাতীয়তাবাদী চেতনাও প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। যদিও সাহিত্যের মধ্যে লেখকদের তখনো সাবধানতা অবলম্বন না করে উপায় ছিল না। শেষে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে এসে সেই লিবার্ল দৃষ্টি ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি, নরমপন্থী ও উগ্রপন্থী মনোভাবের অনেকটা সমন্বয় ঘটে।

এই-কালের মধ্যে—সেই দ্বিতীয় পর্বে—ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'কলোনির রিনাইসেন্‌স' রাজনৈতিক প্রয়াসে রূপ গ্রহণ করে। বাঙলা সাহিত্যে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-চেতনাকে তখন দৃঢ় করে তোলেন তাঁদের নাম অশেষ। আসলে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রায় সকলেই এ-দিকে একভাবে না একভাবে মুক্তি-চেতনাকে সুদৃঢ় করেছেন। যেমন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) "ভারত-সংগীত" (১৮৭৫) স্থূল দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র জাগরণে গান, কিন্তু কথায় ও ভাববস্তুতে তা স্পষ্টত সমসাময়িক কালের পরাধীনের মর্মদাহ—

"অসভ্য চীন, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান ;
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

অথচ হেমচন্দ্রও তখনি (১৮৭৫) লিখেছেন যুবরাজ-(প্রিন্‌স এলবার্ট) প্রশস্তি "ভারত-ভিক্ষায়"। সম্ভবত, 'লিখেছেন' না বলে বলা উচিত, লিখতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, পূর্বাপর হেমচন্দ্রের মতো এমন স্বাধীনতা-বাদী কবি বাঙলায়ও তখন আর কেউ ছিলেন না। তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা, সেখানে তাঁর সাক্ষ্যও সুস্পষ্ট—কি ইলবার্ট বিলের বিরোধী ফিরিঙ্গিদের বিদ্রূপ করায়—

"নেভার সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিভের কাছে অপমান,—নেভার, নেভার!"

কি বাঙালী ভাগ্যান্বেষীর সপরিবারে যুবরাজ-তাঁবেদারির ব্যঙ্গ করায়—

"বেঁচে থাক মুখুজ্জের পো, একটি চালে করলে বাজিমাৎ!"

কিংবা নিজেদের রাজনৈতিক দুর্বলতার মর্মদাহী খেদে—

"পরের অধীন দাসের জাতি, 'নেসেন' আবার তারা!
তাদের আবার 'এজিটেশন'—নরুণ উঁচু করা!"

নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" ক্লাইভ-প্রশস্তি হলেও মোহন-লালের আহ্বান বাঙালী জন-সমাজে স্বাধীনতার আহ্বান রূপে অভূতপূর্ব প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐক্যের স্বপ্ন।

এ-দিকে তখন হিন্দু-মেলা বা জাতীয়-মেলার (১৮৬৭) মাধ্যমে 'জাতীয়-সংগীতের' যুগ আরম্ভ হয়েছিল, আর "ন্যাশানাল থিয়েটারের" প্রতিষ্ঠায় (১৮৭২) আরম্ভ হয়েছিল "নীলদর্পণের" অভিনয়। বৃদ্ধ বিদ্রোহী রাজনারায়ণ বসু, রক্ষণশীল ভূদেব, ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, 'মহিলা'-কাব্যের কবি সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদার, এঁদের নানাবিধ দান সহজেই চোখে পড়ে। "বঙ্গদর্শন", "নবজীবন", "সুলভ-সমাচার" প্রভৃতির কথাও স্মরণীয়। আরও অনেকের দান এত সুস্পষ্ট না হলেও মোটের

উপর সেই সুরেই বাঁধা। পরবর্তী বিবেকানন্দকেও তাই স্মরণ করতে হবে, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদেরতো বাদ দেওয়া অসম্ভবই।

রবীন্দ্র-যুগ ঃ মানবতার বাণী

এর পর রবীন্দ্রনাথের উদয়। দেবেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথের জাতীয় প্রেরণা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথের লিবারল মতাদর্শের সমন্বয় রবীন্দ্রনাথে। কখনো তিনি সে প্রভাবে অধিকতর জাতীয়-ভাবাপন্ন (১৯০০-১৯০৯), কখনো অধিকতর লিবারল মানবাদর্শের প্রবক্তা। কিন্তু তখন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন নখরদংষ্ট্রা প্রত্যক্ষ, 'স্বার্থের সংঘাত' অপঘাতে পৌঁছচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে জন্ম-বিদ্রোহী। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত এমন সুস্থ মানবতা-বোধ তাঁর সমকালীন পৃথিবীর আর কয়জন সাহিত্যিকের দানে মিলবে, তা বলা যায় না। অন্তত, ভারত-মহাভূমিতে এমন মানব-মুক্তির উদ্‌গাতার আবির্ভাব আর ঘটেনি। তথাপি এমন মহাকবিও একেবারে সর্ব-অসঙ্গতি মুক্ত নন—ঔপনিবেশিক জীবনের ট্র্যাজিডি এরূপ গভীর—তিনি রলাঁ বা গর্কী হয়ে উঠতে পারেন নি, অথচ তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা ছিল আরও মহত্তর।

বিংশ শতকের রূপ

স্বদেশী-যুগ ও এই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের পরে অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সন্ধান-সাপেক্ষ নেই। বরং, তখন প্রয়োজন এই কথাটি বোঝা—বাঙলার মৌলিক সামাজিক-

সাংস্কৃতিক অসঙ্গতির ফলে এই সংস্কৃতিক্ষেত্রের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় কি কি ত্রুটি বিংশ শতকেও রয়ে গেল, বাঙলা সাহিত্যের মূলগতি প্রগতির স্বপক্ষে হলেও কোন্ কোন্ ভ্রান্তির জালে তার পা এখনো আট্‌কে যায়; বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষেই বা মুক্তি-যাত্রার পথে চোরাবালি কোথায়; আর বাঙালী সমালোচকের পক্ষেও মুক্তিবাদী সাহিত্য বিচারের পথে কোথায় চোরাবলি; ইত্যাদি। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বা সাধারণ মানবতা আজ বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা (axiom)। অথচ, বাঙলা সাহিত্যে সামন্তবাদ-মোহ এখনো রয়ে গিয়েছে, 'অহিংসা'র নামে নানা মুক্তি-প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা ইদানীং বরং প্রশ্রয় পায় (১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে তা বিশেষ পেত না)। কমনওয়েলথি সৌহার্দ্যের নামে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সমর্থনও (১৯৪৭-এর পর) প্রচলিত। হিট্‌লার-মুসোলিনির প্রতি অযথা মোহও কি বাঙালী সাহিত্যিকের একেবারে নেই? বর্ণচোরা মার্কিনী যুদ্ধবাদিতাও কি একটুও অনুপ্রবেশ করে নি—সাহিত্য বা সংবাদপত্রে? তথাপি সাধারণ-ভাবে সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য যে মানবতার ও স্বাধীনতার শিবিরে তা একটা অভ্রান্ত সত্য। কারণ, এ ঐতিহ্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রায় জন্মগত। মানুষকে আমরা তখন থেকে আবিষ্কার করে চলেছি।

বৈশাখ, ১৩৫৮ বাং

বঙ্কিম-সমস্যা

ভূমিকায় বলে নিতে চাই কয়েকটি কথা—সাধারণ সাদিচ্ছা-সম্পন্ন পাঠক আমার ব্যক্তব্যকে কি দৃষ্টিতে বিচার করবেন, তা। এ-কথা বেশ জানি অসাধারণ পাঠকও আছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধারণদের জন্যই লিখি সর্বাগ্রে এই ভূমিকাঃ (১) আমার বক্তব্য এখনো আমার চূড়ান্ত বিচার নয়, সজ্ঞান জিজ্ঞাসা। (২) বঙ্কিমকে যাঁরা নিছক প্রতিক্রিয়াবাদী মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে এ-জিজ্ঞাসায় আমার মনান্তর সুদৃঢ; যাঁরা বাঙ্কিমকে যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক মনে করেন, তাঁদের সঙ্গেও আমার মতান্তর সুস্পষ্ট। যদি এ প্রবন্ধে এ দুই কথা পরিষ্কার না হয় সে আমার লেখার দোষে।

আলোচনার পটভূমিকাও জেনে নিইঃ—বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা উনবিংশ শতকের বাঙালী (সামান্যাংশে সর্বভারতীয়) সমাজ-সমস্যার বিচারের সঙ্গে জড়িত। বাঙলা দেশের ও উনবিংশ শতকের সম্বন্ধে বিচার শেষ হয়নি। আমার বিবেচনায় সংক্ষেপেঃ যুগটা ঔপনিবেশিক সমাজের যুগ—জীবনে-চিন্তায় স্ববিরোধ তার প্রায় প্রত্যেকটি ধারায় পাওয়া যায়। এ-শতকের কোনো একটি বড় প্রয়াসকে শতকরা শত-মাত্রায় প্রগতি-সম্পন্ন বলা সম্ভব নয়, এবং প্রায়ই কোনো একটি বড় প্রয়াসকে একেবারে শতকরা শত-মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল বলাও সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য এমন মানুষ দু'একজন আছেন যাঁরা,

আমার বিবেচনায়, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রগতিশীল—যেমন, বিদ্যাসাগার, অক্ষয়কুমার দত্ত (দু'জনেই আমার বিবেচনায়, সাহিত্য-শিল্পী নন, প্রবন্ধ-সাহিত্যক, গদ্যের স্রষ্টা)। এঁদের তুলনায় কোনো কোনো দিকে রামমোহনও খাটো হয়ে যান—যদিও তিনিই 'যুগ-প্রবর্তক' বলে গণ্য। অন্যদিকে এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা শতকরা নব্বুই ভাগই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ, বঙ্কিমকেও 'উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়' বলে সেদিন যাঁরা হিন্দুসমাজ-নাশী মনে করতেন, তাঁরা সংখ্যায় তো কম ছিলেন না। তবু মোটের উপর ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জীবন ছিল প্রগতিরই দিকে গতিশীল; ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যও ছিল **মোটের উপর স্বাধীনতাবাদী,** অল্লাধিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী (মুখে ও মনে); **কিন্তু সে পরিমাণে গণতান্ত্রিক নয়,** সে পরিমাণে ভারতীয় সামন্তবাদ-বিরোধীও নয়। গণতন্ত্রবাদী তেমন নয়, তার প্রধান কারণ সাহিত্য-স্রষ্টাদের সামাজিক পিছুটান। ভদ্রলোকের টিকি বাঁধা তখনো সাম্রাজ্যবাদের জুতোয়, জমিদারিতন্ত্রে ও চাকুরিতে। চাকুরের সাহিত্য অল্লাধিক চাকরের সাহিত্য। সেই কারণেই সম্পূর্ণ পরিমাণে তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীও নয়। যেহেতু ব্রিটিশ-শাসন তখন দণ্ডধারী (প্রেস-অ্যাক্ট না মেনে কি এখনো উপায় আছে ?), তাই কমলাকান্তের মতোই ধোঁয়ার ছল করে কাঁদতে হত এটি স্মরণীয়। আবার এই ব্রিটিশ-শাসনও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে

নগ্নরূপে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তখনকার স্বাধীনতাকামীদের সাধারণ চোখে ধরা পড়েনি। তাই দেখি অমন বিদ্যাসাগর সিপাহীবিদ্রোহের দিনে সিপাহীদের সামন্তবাদী সংস্কারের কথা ভেবে ভয়ে রাত জেগে সংস্কৃত কলেজ পাহারা দেন, বৃদ্ধ-বিপ্লবী রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে হেডমাস্টারি করতে করতে চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন—সিপাহীরা ক্ষমতা পেলে নতুন শিক্ষাদীক্ষা সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে। হরিশ মুখুজ্জের মতো লোকই তখন কি সমর্থন করেছেন সিপাহীদের? প্রমাণ পাই না। তাই সেদিনের কোনো একটি বাঙালীর মুখেও সিপাহী- বিদ্রোহের প্রকাশ্য সমর্থন শুনি না ('হুতোম'-এর বক্রোক্তি অবশ্য সুবিদিত)। এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের স্পষ্ট উল্লেখ না করলেও নিশ্চয়ই ছিলেন স্বাধীনতাকামী; সিপাহী-বিদ্রোহে আস্থাশীল নয়, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়েই বিদ্রোহী (কোনো কেনো বিষয়ে অবশ্য ইংরেজের মুখাপেক্ষী ছিলেন কোনো কোনো ব্রাহ্ম)। অপ্রসাঙ্গিক না হলেও সিপাহী-বিদ্রোহ এখানে আলোচ্য নয়, সে বিদ্রেহের স্ববিরোধিতাও স্পষ্ট। তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যতটা, ততটা সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নয়। আর আমার নিজের জিজ্ঞাস্য: উত্তর ভারতে যদিও তা জন-বিদ্রোহ ছিল, বাঙলার জনগণের কোনো অংশকে সিপাহীরা স্পর্শ করতে পেরেছিল কি? অবশ্য এ প্রসঙ্গে এখানে অলমতিবিস্তারেণ।

বিচার-পদ্ধতি

উনবিংশ শতকের এই স্ববিরোধী বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের মধ্যে বঙ্কিম কতটা ছিলেন প্রগতিপন্থী, কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ? তা-ই জিজ্ঞাস্য। কিন্তু তার আগে আর একটু কথা স্থির করা প্রয়োজন—বিচারের পদ্ধতিটা কি ? আমার বিবেচনায়, বিচারের প্রধান প্রধান ধারা হল এই (আরও অপ্রধান ধারা আছে, অনু-ধারা আছে) : (১) সাহিত্য-বিচার ও আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিচার এক জিনিস নয়, পরস্পর-সম্পৃক্ত জিনিস। (২) আর্থিক অবস্থা হল 'বেস্' বা মূলগত এবং সাহিত্যবস্তু হল শিরঃস্থানীয় (সুপারস্ট্রাক্চার)। বোধহয় এটা স্বীকার্য। (৩) শিরঃস্থানীয় সৃষ্টিও আর্থিক অবস্থারই অনুযায়ী হয়, কিন্তু তা শুধুমাত্র অবস্থার নিছক প্রতিফলন বা ফটোগ্রাফ্ নয়। অর্থাৎ মূলগত বস্তুর সঙ্গে শিরঃস্থানীয় বস্তুর সম্পর্কটা জটিল, অনেক সময়েই দুর্লক্ষ্য। এমন কি, যথার্থ সৃষ্টিতে সেই তত্ত্ব থাকে গুপ্ত। এ-বিষয়ে এঙ্গেল্স-এর উদ্ধৃতিও দেওয়া চলে। শিরঃস্থানীয় বস্তুবিচারে তাই তো এত শিরঃপীড়া। বিচারে যান্ত্রিকতা (মেকানিস্টিক) হাস্যকর, ক্ষতিকর। (৪) শিরঃস্থানীয় সর্ববস্তুই সমান দুর্লক্ষ্য নয়। আইন-কানুন, সামাজিক প্রথা-নিয়ম বিষয়ী-প্রধান (অব্জেকটিভ্) বলে যত সহজে যাচাই করা যায়, দর্শন, সাহিত্য-শিল্প বিষয়ী-প্রধান (সাব্জেক্টিভ্) বলে তত সহজে যাচাই করা যায়

না। তা বহু বিচার সাপেক্ষ। (ক) সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন রূপ-ধারার বিচারেও দেখি কোনোটির বিচার সহজ, কোনোটির সহজতর, আবার কোনোটির বিশেষ অনুসন্ধেয়, দুর্লক্ষ্য। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচার সহজ, স্যাটায়ার বা বিদ্রূপের বিচার সহজতর। অথচ কথাকাব্য ও কথাসাহিত্যের বিচার তত সহজ নয় (নাটকে বাস্তবতা কিন্তু সহজ প্রত্যক্ষ), গীতি-কবিতায় ও গানে এ-বিচার প্রায়ই সুকঠিন। (খ) বাঙলা দেশের ঔপনিবেশিক জীবনের আত্মদ্বন্দ্ব সাহিত্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে, তা স্মরণীয়। অনুসন্ধেয় তাই কোথায় হচ্ছে ও কতটা হচ্ছে। যা সহজে চোখে পড়ে (যেমন সাম্প্রদায়িকতা বা ইংরেজ-প্রীতি বলে) তা-ও আবার মমত অন্যরূপ হতে পারে—সর্বত্র নয়, বিশিষ্ট বস্তু বিষয়ে। এ-সত্য মনে না রাখলে বিচারও সত্য হবে না।

বিচার-সংকটে উক্ত পদ্ধতির সঙ্গে আরও যোগ করা যায়ঃ (৫) উক্ত কারণে এক-একটা যুগ-বিচার (যেমন, ঊনবিংশ শতক) যতটা সুসাধ্য, এক-একটি সাহিত্যিক (যেমন, বঙ্কিম)-বিচার ততটাই কঠিন হওয়া অসম্ভব নয়। আর এক-একটি রচনার বিচার মূল্যহীন না হলেও তা থেকে লেখক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক। (৬) অতএব, বিশেষ একজন সাহিত্যিকের বিচারকালে (ক) তাঁর সামগ্রিক রচনা সমগ্রভাবে বিচার করা শ্রেয়ঃ; (খ) তাঁর পরিচয়-সূচক প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা সে দিকে সর্বাধিক গুরুতর (তাতেও স্ববিরোধিতা থাকতে

পারে); (গ) পাঠক-সাধারণের মনে তাঁর রচনা তাঁর কালে কি ছায়াপাত করেছে এবং এখনই বা কি ছায়াপাত করে— এ-সবও অনুধাবনীয়। নইলে বিশেষ কতকগুলি উক্তি-উদ্ধৃতি বিচার নয়, সে তো ওকালতির ম্যারপ্যাঁচ। (৭) আর একটা কথা গোড়াতেই যেন বুঝে রাখি—সাহিত্য-বিচারে সাহিত্য বিচার করছি, না, মানুষ ও তার মতামতের বিচার করছি? বাহ্যবিচারে সহজেই রায় দেওয়া যায় বঙ্কিমের ক্ষেত্রে— বঙ্কিম ডিপুটিবাবু, ব্রাহ্মণের সন্তান, অতএব ব্রিটিশের বান্দা, সামন্ততন্ত্রের স্তম্ভ। ঠিকই, কিন্তু তা বঙ্কিম-সহিত্য বিচার নয়, ভাল্‌গার মার্কসবাদ মাত্র। পদ্ধতির ফিরিস্তি আরও বাড়ানো চলে, কিন্তু তা থাক্।*

আমি কি চোখে বাঙলা সাহিত্যের উনবিংশ শতক দেখি, তা উপরে যত সংক্ষেপে সম্ভব বলেছি। আমি কি পদ্ধতিতে বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা পরিচালনা করি, তা-ও উপরে লিখেছি। এর পরে বিশদ করে বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা—ক্ষুদ্র পরিসরে—

*বঙ্কিম আলোচনার পূর্বকথা প্রয়োজন কিনা জানিনা। উনবিংশ শতক ও সে-প্রসঙ্গে বঙ্কিমকে নিয়ে মোটামুটি এ-কয়টি আলোচনা এ প্রবন্ধে বিবেচ্য ছিল: 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ, 'পরিচয়'-এ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ; 'পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের আলোচনা; 'সাহিত্যপত্রে' (মাঘ ১৩৫৯) ভবানী সেনের "উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শগত সংগ্রাম"; এবং 'সাহিত্যপত্রে' পতঞ্জলি রায়ের 'আনন্দমঠ'-এর তথ্যগত বিচার। শেষ লেখাটি সাহিত্যগত বিচারও কিনা, বেজ্-সুপারষ্ট্রাক্‌চার সম্পর্কের বিচার কিনা, লেখক তা স্পষ্ট করে বলেননি। তাঁর উদ্ধৃত তথ্য অবশ্য স্বীকৃত।

কতকটা অসম্ভব, কতকটা অনাবশ্যক। তবু সূত্রাকারে তা বলছি। কিন্তু প্রশ্ন থাকে : (১) বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে কোন্ বঙ্কিম প্রধান, কোন্ বঙ্কিম অপ্রধান? প্রবন্ধকার বঙ্কিম, না সহিত্য-স্রষ্টা ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম? প্রবন্ধকারের মধ্যেও আবার 'সাম্য', 'বাঙ্গালার কৃষক', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'মুচিরাম গুড়', 'অনুশীলনতত্ত্ব', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতির স্রষ্টা বঙ্কিম আছেন, এবং 'প্রচার'-এর লেখক (তখন অক্ষয়কুমার সরকারও ছিলেন তাঁর সহযোগী), বিধবা-বিবাহবিরোধী, প্রেস-অ্যাক্ট্-জমিদারতন্ত্রের সমর্থক প্রবন্ধকার বঙ্কিমও আছেন। যিনি আগে তিনিই প্রধান? না, যিনি পরবর্তী তিনিই প্রধান? বঙ্কিম কি আগে মরলে বেঁচে যেতেন?—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ক্রমশই তিনি রক্ষণশীল মতবাদের উপর জোর দিতে থাকেন।

বঙ্কিমের বিভ্রম

এ-সব প্রশ্নে আমার একটি মানদণ্ড—সাহিত্য-বিচারের কথিত পদ্ধতির; যথা—সামাজিক অবস্থা সাহিত্য-সৃষ্টিতে কি পরিমাণে, কি পথে প্রতিফলিত হয়, ও এ-ক্ষেত্রে বঙ্কিম-সাহিত্য—ঔপনিবেশিক যুগে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে কী হয়েছে। দ্বিতীয় মানদণ্ড—পাঠক-সাধারণের জীবনের ও চেতনার সাক্ষ্য। অর্থাৎ কোন্ বিশেষ প্রভাব পাঠক-সাধারণের মনে পড়েছে? ডিপুটিবাবু ও উপন্যাস-স্রষ্টাতে একেবারে সর্বাংশে তফাৎ না করেও বলতে পারি, বঙ্কিমের উপন্যাসই এখানে প্রধান বিচার্য, প্রবন্ধ

ও মতামত গৌণ। কে আজ ততটা মনে রাখে 'অনুশীলন', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'সাম্য' ও 'বাঙ্গালার কৃষক'-এর বঙ্কিমকে? সবাই মনে রাখে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে। নইলে তো একথাও মনে করতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বঙ্কিম বাঁকা কেন?' ('ধর্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলন'-এর যুক্তিনিষ্ঠ ধর্ম ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণের বিচারে 'বাঁকা')। বঙ্কিম উত্তর দেন, 'জুতোর চোটে'। এ জুতো কোন্ জুতো? ১৯৪৭-এও যা মাথা থেকে একেবার নামেনি, আর 'ডিপুটি বঙ্কিম'ও যা মুচিরাম গুড়দের মতো মাথায় বহন ক'রে বেড়িয়েছেন। আবার, সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমেরও সমগ্র উপন্যাসই ('কমলাকান্ত' শুদ্ধ), আমার বিবেচনায়, প্রধান; এবং তার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ('আনন্দমঠ' শুদ্ধ, যদিও 'আনন্দমঠ' সাহিত্য হিসাবে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়) উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহই গ্রাহ্য। এবং বঙ্কিমের প্রভাব কি রূপে পড়েছে বাঙালী সমাজে, সাহিত্যে, তা বিচার্য এসব রচনার বিচারের সঙ্গে। বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির একটি ফল সংক্ষেপে এই—শতকরা ৫৪জন বাঙালী, মুসলমান বাঙালী, তাতে ক্ষুব্ধ। এ-ক্ষোভ কতকটা তাঁদের ভ্রান্তিবশত হতে পারে (যা কাজী আব্দুল ওদুদ চমৎকাররূপে বিশ্লেষণ করেছেন); কিন্তু এ ক্ষোভ একটা বাস্তব সত্য, বৃহৎ সত্য, স্মরণীয় সত্য। বঙ্কিম তাই 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' সর্বস্বীকৃত স্রষ্টা নন (যেমন স্রষ্টা নজরুল)। তিনি তাঁর সৃষ্টিদ্বারা বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রেরণা জুগিয়ে

পুষ্ট করেছেন, আবার তা খর্বিত করেছেন—মুসলমান বাঙালীকে প্রতিক্রিয়াশীলদের দিকে ঠেলে দিয়ে। এইখানে বঙ্কিমের ব্যর্থতা।

এই প্রসঙ্গে এ-সত্যটা আমি মানি—(ক) সংখ্যাধিক পাঠকের সাক্ষ্যই সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়; (খ) মুসলমান পাঠক একটু অবিচারও করেন বঙ্কিমের প্রতি; (গ) উপন্যাসের বঙ্কিম ইতিহাসে যে 'হিন্দু বনাম মুসলমানের' সংগ্রাম দেখেন তা ইতিহাসেও তো একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু তথাপি অনেকাংশেই বঙ্কিমের পক্ষেও তা আসলে শাসক-শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে আক্রান্ত বনাম আক্রমণকারীর, অত্যাচারী প্রবল বনাম অত্যাচারিত সমসাময়িক দুর্বলের সংগ্রামের প্রতিলিপি—ধোঁয়ার ছল করে লেখকের কাঁদা। 'আনন্দমঠ'-এর উপর ইংরেজ অকারণে তখন চটেনি। তবু তাও সব নয়—সে ধোঁয়া যে হিন্দু-মুসলমান দুয়েরও চোখে যায়; সে ধুলো যে ইংরেজের চোখে যত না পড়ে তার চেয়ে বেশি পড়ে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর চোখে। ১৯০৫ পর্যন্ত কেন, 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'রাজসিংহ', হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' হতে এ-ভাবেই আমরা নিজেদের মনের উদ্দেশ্যকে মুখের কথায় ব্যর্থ করেছি বার বার—বিংশ শতকের নাটকে ও রঙ্গমঞ্চেও। (ঘ) ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত তথাপি বঙ্কিমের প্রভাব মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে, বাঙালীর জাতীয় স্বাধীনতা

আন্দোলনের স্বপক্ষে কার্যকর ছিল। তারপরে একথা বলা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। (ঙ) এ-প্রসঙ্গেই একটি প্রধান কথা বোঝবার মতো : ঔপনিবেশিক বাঙালী সমাজে স্বাজাত্য-বোধ যখন জাগল তখন (রঙ্গলালের সময় থেকে) তা ইতিহাসে মাল-মশলা খোঁজে। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত ভারতের জন-ইতিহাস অজ্ঞাত ও অকল্পনীয় ছিল; ইতিহাস বলতে জানা ছিল মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান শাসকবর্গের দ্বন্দ্বের ইতিহাসই। বঙ্কিম সেই মধ্যযুগের মধ্য থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন জাতীয় আত্মমর্যাদার ও জাতীয় আত্ম-বিকাশের নতুন বস্তু। তাতে ভুল ঘটা ছিল অনিবার্য। কারণ, মধ্যযুগের (শাসক-বিধৃত) ইতিহাসই যে 'টু নেশান' নামক মিথ্যা তত্ত্বের পরিপোষক। (চ) সেই ঔপনিবেশিক স্বাজাত্যবোধ বঙ্কিমের আত্মমর্যাদা-বোধকে এর পরে আরও তাড়িত করে, বিজয়ী ইংরেজের বিরুদ্ধে (রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে) বিজিত (হিন্দু) ভারতের ও বাঙালীর (হিন্দু) সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনায় প্রবৃত্ত করে। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ও উপন্যাসের তলায় এই জাতীয় মর্যাদা দ্বারা সংক্ষুব্ধ মন কি দেখা যায় না? সেই জাতীয় মর্যাদা-বোধ (যা বেশে হিন্দু জাতীয় মর্যাদা-বোধ) তাঁকে বিজেতার সাংস্কৃতিক জয়ের বিরুদ্ধে (বঙ্কিম যদিও বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও যুক্তি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন) তাড়িত করেছে আরও বিপথে—জাতীয় সংকীর্ণতার দিকে, তা দেখা

দিল তাঁর হিন্দু-সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ আঁকড়িয়ে ধরায়। কিন্তু এখানেও বঙ্কিমের ভ্রান্তির শেষ নয়। এই আত্মভ্রষ্টতাই আবার বারে বারে শিল্পী বঙ্কিমের, স্রষ্টা বঙ্কিমের কলম চেপে ধরে তাঁকে বাধ্য করেছে আপন চরিত্র-পরিকল্পনা ব্যাহত করতে; ব্যাহত করতে আপনার স্রষ্টাসত্ত্বাকে—উপন্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে হাস্যকর করে তুলতেও। এই খানেই শিল্পী বঙ্কিমের ব্যর্থতা।

বঙ্কিমের কীর্ত্তি

কিন্তু আসল কীর্তি বঙ্কিমের উপন্যাস—সমগ্র উপন্যাস (তার আখ্যানের গলদ পূর্বে দেখেছি)। তার মধ্যে আসল কথা,—দুটি প্রধান বুর্জোয়া সত্য বঙ্কিমের উপন্যাসে অনির্বাণ—তিনি মানুষের সামন্ত-সামাজিক বন্ধন ছেদন করে তাকে ব্যক্তিসত্তার বেদীতে দাঁড় করিয়েছেন। এর দুটি দিক: (ক) নর ও নারী দুইই ব্যক্তিসত্তার মহীয়ান হয়ে উঠেছে। এর পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি ছিল সামান্য, যথা, কবিকঙ্কণে, 'অন্নদামঙ্গলে'। চরিত্র-সৃষ্টি অর্থই মানব-স্বীকৃতি। দীনবন্ধুতে তার বোধ সীমাবদ্ধ হলেও প্রখর। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার যথার্থ উপলব্ধি বঙ্কিমেই প্রথম, আর বঙ্কিমের প্রেরণায় বাঙলা সাহিত্যে-সৃষ্টিতে তাঁব পরে মানুষের এই স্বীকৃতি অনিবার্য। (খ) মানুষ বিশিষ্ট, জীবন দ্বন্দ্বময়, মানুষ একরঙা ছবি নয়, মানুষের জীবন একটানা বয়ে যায় না—নগেন্দ্রনাথ নিজের একনিষ্ঠতা হারান, গোবিন্দলাল রূপের মোহে গুণ ত্যাগ করেন। ভ্রমর আধুনিক মর্যাদাময়ী

নারী, সূর্যমুখী আধুনিক পতিপ্রাণা নারী। আর বিধবা কুন্দ ও রোহিণীও নিজেদের সঁপে দেয় পরপুরুষের প্রেমে।—দিবেই তো, মানুষ তারা। শুধু কি তা'ই? আপন প্রকৃতি ও ঘটনার দ্বন্দ্বে কোমলা কুন্দ আত্মহত্যা করে, আর সেই দ্বন্দ্বে প্রথম পাতার রোহিণীর ভিতর থেকে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসে ব্যাপিকা রোহিণী; সে হয়ে দাঁড়ায় শেষ পাতার স্বৈরিণী রোহিণী। হবেই তো, বিধবা হলেও সব বিধবা একরূপ নয়, সর্ব-পরিবেশ এক নয়। ধর্মপত্নীত্ব-স্বীকৃতি ও উপপত্নীত্ব স্বীকৃতি এক জিনিস নয়। কুন্দ রোহিণী নয়, রোহিণী কুন্দ নয়। সেরূপ সূর্যমুখী ভ্রমর নয়, ভ্রমরও সূর্যমুখী নয়। মানুষ বিচিত্র। এক হলে, জীবনের অনেক জঞ্জাল চুকে যেত, মানুষের অনেক বৈচিত্র্য বেশ একমেটে, সরল হয়ে উঠত—মানুষও দ্বন্দ্বময় হত না। এবং মেকানিস্টিক্ মার্কসবাদের সাহিত্য-বিচারে সুবিধা হত; অথবা ক্রিয়েটিভ্ আর্ট ও ক্রিয়েটিভ্ মার্কসবাদ দুইই অচল হয়ে যেত।

কিন্তু এই প্রগতিশীল শিল্পচেতনাও বঙ্কিম বারে বারে বিসর্জন দিয়েছেন মতবাদগ্রস্ত হয়ে, এ-কথাও কিছুমাত্র তুচ্ছ করা চলবে না। উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশ, ঘটনা-বিন্যাস সবই তাতে পঙ্গু হয়েছে এবং বঙ্কিমের প্রতিভাও পঙ্গু থেকে গিয়েছে।

ইচ্ছা থাকলেও বঙ্কিমের প্রধান প্রধান উপন্যাস নিয়ে একে একে বিচার করা এখানে সম্ভব নয়। ছোট ছোট কথা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন, বঙ্কিমের দৈববলে বিশ্বাস।

অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। বুর্জোয়া সাহিত্যেই কি ওসব বিভ্রান্তি একেবারে অজ্ঞাত? উপন্যাসে সেদিন যা অলৌকিক, তা পরের দিনে হয় 'দৈবঘটনা' (অ্যাক্সিডেণ্ট), এবং সবশেষে এদিনের মনোবিজ্ঞানের আকস্মিক 'ফাল্‌ পাড়া'। তথাপি নিশ্চয়ই অলৌকিকের শরণ নেওয়া বঙ্কিমের ক্রটি।

পরিষ্কার ভাষায় বলব বঙ্কিমকে টল্‌স্টয় বা সেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনা করা নিরর্থক—বঙ্কিম সেক্‌স্‌পীয়র নন, বঙ্কিম টল্‌স্টয় নন। টল্‌স্টয়ের পাতায় রুশ কৃষক জীবন্ত, বঙ্কিমের উপন্যাস কৃষক-বর্জিত। আর সেক্‌স্‌পীয়র? য়িহুদীদের ধর্মগ্রন্থে বলে 'ভগবানের নাম বৃথা উচ্চারণ করো না।' আমার বিবেচনায় —সাহিত্যিকদেরও সেক্‌স্‌পীয়রের নাম বৃথা উচ্চারণ করা উচিত নয়।

সংক্ষেপে বঙ্কিম-সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় আমার শেষ কথা বলি: এ-বিচারে শেষ কথা নেই—তা বলবেন সচেতন জনসমাজ ও তাঁদের সচেতন সাহিত্য-বিচারকরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে। অন্তত আমার এখনো শেষ কথা নেই, আছে জিজ্ঞাসা।

তথাপি যে-কথাটিতে সমগ্রভাবে দেখলে আমি অনুমোদন পাই, তা মেলে কাজী আব্দুল ওদুদের বঙ্কিম-বিষয়ক চিন্তায়: "নব-বাঙালীত্বের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। নব-বাঙালীত্ব সমগ্রভাবে দেখলে নিশ্চয়ই প্রগতিশীল। "কিন্তু সমগ্রভাবে দেশের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মহান বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবার সামর্থ্য তাঁর (বঙ্কিমের) ছিল না।" (শাশ্বত বঙ্গ, পৃঃ ২৩৮)। নিশ্চয়ই জাতীয় প্রগতির পক্ষে এ ক্ষতিকর এক অক্ষমতা।

কিন্তু এক-কথায় বঙ্কিম কি?—জিজ্ঞাসা করবেন এক-কথার বন্ধুরা। উত্তর : উনবিংশ শতকের বাঙলা সম্বন্ধে এক-কথা খাটে না, খাটে না বঙ্কিম সম্বন্ধেও। এরূপ ক্ষেত্রে এক-কথা—ফরমূলা—ডগ্‌মা। আর ডগ্‌মা সত্যের শত্রু।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ বাং

রবীন্দ্রকাব্যে মানব-স্বীকৃতির রূপ

এই পৃথিবীতে যখন 'সভ্যতার সংকট' আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, আণবিক অস্ত্র সভ্যতার নিয়মে ধিকৃত নয়, জীবাণু-যুদ্ধও সভ্যতার বিধি-বিধানে অস্বীকৃত হয় না, তখন শুধু একবার নয়, বারবার স্মরণ করবার দিন এসেছে কবি শেলির উক্তি, শাশ্বত কালের এই সত্য—"কবিরাই, শিল্পীরাই পৃথিবীর বিধি-বিধানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা, শ্রেষ্ঠ শাসক পৃথিবীর।" রাজা-রাজড়াদের কীর্তি ও অকীর্তি তো প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রপরিচালকদের কূটনৈতিক কারবারের নৌকা লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের যে সম্ভারে জাতির জীবন-ঘাটা বোঝাই করে তোলে বা যেভাবে অতলে তলিয়ে দেয় জাতির ভাগ্য, তা-ও ইতিহাসে অগোচর নয়। কিন্তু বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক যাত্রাপথে কী ই বা তাদের কীর্তি ও অকীর্তি? সমস্ত ইতিহাসের মহৎ সাক্ষ্য এই—'তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে।' সেই ছন্দটি কবির দান, তাতেই মানুষের যাত্রাপথ সানন্দে স্বীকৃত; জীবনের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক সৃষ্টিতে উজ্জ্বল, নব নব অনুরাগে নবায়মান। "কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।"

"কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এই

বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি।"

সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের মানুষ ভালোবেসেছে শান্তি। এ-দেশের মানুষকে এ-দেশের কবি ও কলাকার সেই পরিচ্ছন্ন বিধানেই জীবন স্বীকার করতে শিখিয়েছেন, যে-বিধানের মূল সত্য—শান্তম্, শিবম্, সত্যম্। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিধানের স্বীকৃতির সঙ্গে তার বিকৃতির অভাব নেই। শান্তি, শিব ও সত্য তাদের নিকট বিশেষ করে একটা পারমার্থিক সাধনা হয়ে উঠেছিল, ততটা সমাজের বাস্তব আদর্শ হয়ে ওঠেনি। মানুষের মর্তমহিমা অপেক্ষা তার পারত্রিক সম্ভাবনাই অধ্যাত্ম-চিন্তায় গুরুত্বলাভ করেছে বেশি। তাই তো এই ইতিহাস এমন ট্র্যাজিডির বেদনায় মর্মান্তিক। কিন্তু তাই বলে এই বিধান মিথ্যা নয় যে, সমাজে ও জীবনে শান্তি, কল্যাণ ও সত্য মানুষের পরম আশ্রয়; তারই বনিয়াদে ভারতে রচিত হয়েছে ভারতীয় মানবিকতার সাধনা।

সভ্যতার ট্র্যাজিডিও আজ কম ভয়ঙ্কর নয়। তাই এই সভ্যতার মধ্যখানে যে শাশ্বত বিধান তার কবি আর ভাবুকেরা রচনা করে গিয়েছেন—যে-বিধানকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে তার সৃষ্টি—সত্যম্, জ্ঞানম্, আনন্দম্,—বিশ্বভুবন-জোড়া মানুষের এই প্রকাশের রাজ্য—সেই বিধানকে আজ কবির কাব্যে, বৈজ্ঞানিকের তপস্যায়, কর্মীর সাধনায় সকল দিক দিয়ে স্বীকার

করার আয়োজনও সভ্যতারই দায়ে পরম প্রয়োজন। কবি, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব এই জ্ঞানকে, কল্যাণকে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আপন-আপন সাধনায়, আর মানুষের মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা সভ্যতার সকল বিকৃতির ঊর্ধ্বে। এ-যুগে মানুষের এই মহৎ নিয়তিকে এমন করে কে আর অভিনন্দিত করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতো? বাঙালীর মানব-স্বীকৃতি রবীন্দ্রকাব্যেই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে অপরূপ বিস্তার লাভ করেছে—আমাদের কথাসাহিত্যেও সে তুলনায় মানুষের পরিচয় সুপরিণত নয়।

কবিসত্তার পরিণতি

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের নাম 'শান্তিনিকেতন,' রবীন্দ্রনাথের স্ব-রচিত সাধনপীঠ 'বিশ্ব-ভারতী'—'যত্র বিশ্বঃ ভবত্যেকনীড়ম্'—রবীন্দ্র-সাধনার এই দিকটি নিতান্ত অবান্তর বা আকস্মিক নয়। কবির প্রত্যেকটি মহৎ আয়োজন ও মহৎ পরিকল্পনায় এই শান্তির বাণী, মানুষে মানুষে মৈত্রীর বোধন সুস্পষ্ট। তার প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। কি বিশ্বলীলায় বিমুগ্ধ কবি হিসাবে, কি কর্ম-কঠিন সংসারের মানুষ হিসাবে, তিনি সৃষ্টিকেই আপনার ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন। যা-কিছু ধ্বংস-সাধক, যা-কিছু বিকৃত, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী মনের বিরাগ প্রকৃতিগত। সুস্থ সৃষ্টিশীল সকল মানুষের পক্ষেই তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রকৃতিগত বিরাগ কবির সচেতন সাধনায় ও জীবন-

দর্শনেও পরিণত হয়েছিল—সে-ইঙ্গিতও আছে তাঁর কাব্য-সাহিত্যে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাতেও তা সুস্পষ্ট।

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুভব করেছিল, 'একটি অখণ্ড তাৎপর্য'। "যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে, লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেন না এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই।" আসলে এ শান্তি তখনো পূর্ণাঙ্গ নয়, এ দৃষ্টিও সম্পূর্ণ নয়। মাতৃগর্ভের শিশু মায়ের সত্তাতেই সত্তাবান থাকে, আপন সত্তায় নয়; এও তেমনি—কবির প্রকৃতিলীন ও নিশ্চেতন রসতন্ময়তা। মাতৃগর্ভ ছেড়ে সেই মানব-শিশু কিন্তু ভূমিষ্ঠ হয়, বিশিষ্ট হয়, হয় নতুন প্রাণ। সে-পর্বকেও রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, "এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা।...এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।" তখনো সেই শিশু-সত্তা জানে না আপন বৈশিষ্ট্যকে; সে তখনো প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় লীলাসহচর মাত্র—সৃষ্টির দ্বৈতলীলার সহকারী নয়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে প্রায় 'চিত্রা' পর্যন্ত কবি এমনি লীলা-বিমুগ্ধ কবি-কিশোর।

অবশ্য প্রকৃতির বুকে এই যে শান্তি বিরাজমান, এ শান্তির

অর্থ নিস্তব্ধতা নয়,—সে বিরাট নদী চির-চঞ্চল, আর সেই আলোড়িত বস্তু-পুঞ্জকে ছেয়ে আছে বিরাট সুষমা (হার্মনি)। এই গতিময় বিশ্বে শান্তির অর্থ তাই গতির স্বাচ্ছন্দ্য, সুষমা। শিশু-প্রকৃতি সেই সুষমার সহজ আস্বাদনে স্বচ্ছন্দ।

কিন্তু এই বিশ্ব-সুষমার মধ্যে মানুষ এক সচেতন ও সক্রিয় শক্তি। মানুষের উপরে তাই একদিকে দাবী নিখিল বিশ্বের—প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য নবায়মান সামঞ্জস্যে তার কর্ম ও চেতনা সার্থক হোক, হোক মানুষ সৃষ্টির প্রত্যক্ষ সহযোগী। অন্য দিকে তার ওপর দাবী মানুষের আপন জীবনগতির—তার আপন কর্ম ও চেতনার সংযোগে মানুষের গতিপথ হোক স্বচ্ছন্দ; আত্মক্ষয় ও আত্মঘাত থেকে মানুষ মুক্ত করুক আপনাকে, শান্তিতে সুষমায় তার সৃষ্টিশক্তি লাভ করুক অখণ্ডিত প্রকাশ। সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে সৃষ্টির এই দাবীরই ক্রম-পরিপূরণ চলেছে, কিন্তু সেই মহৎ পরিণতি এখনো মানুষের অনায়ত্ত। মানুষের ইতিহাস এখনো আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বে খণ্ডিত: তাই মানুষ আসলে এখনো তার প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—যেখানে বাধা-বিঘ্নে জীবনের গতি অস্বচ্ছন্দ, সৃষ্টি পদে পদে খণ্ডিত।

এই খণ্ডিত প্রয়াসের স্বরূপ মানুষের সংসারে বাস করে কবি-প্রাণ আরও তীব্রতর ও গভীরতর করেই অনুভব করে। প্রকৃতির সুষমা-সুন্দর রূপও কবিকে মানুষের সংসারে এই সাধারণ ভালোমন্দময় দ্বন্দ্ব ভুলিয়ে দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের

জীবনেও তাই শেষ হয়ে গেল 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা'। 'এবার ফিরাও মোরে'—প্রকৃতির লীলাসহচর কবি সেদিন প্রার্থনা করলেন তাঁর কবি-নিয়তির কাছে,—'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'। কিন্তু তখনো সে কষ্টের স্বরূপ কি তিনি উপলব্ধি করেছেন ? সে কবিতাটি পাঠ করলে সন্দেহমাত্র থাকে না তাঁর আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতায়, কিন্তু সন্দেহ থাকে তাঁর কবি-দৃষ্টির স্বচ্ছতায়। তথাপি কবি অনুভব করেন 'আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি'। মানুষের এই ব্যবহারিক জগতে না দাঁড়িয়ে কোন মানুষেরই উপায় নেই। এই সংঘাতের মধ্যে না দাঁড়ালে কবি-প্রতিভার পক্ষে মুক্তি আরও অসম্ভব। 'আঘাত সংঘাতে'র এই অভিজ্ঞতায় কবি-চিত্ত নব-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারল। তাঁর স্বকীয় ধর্মানুভূতিতে এ-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিবম্-এর বোধঃ—"বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে ঐক্যটি কী ? সেই হচ্ছে শিবম্। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্ ; সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না. এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।"

এই 'শিবকে জানার বেদনা'—রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির পক্ষে প্রথমাবধি অবশ্য তত সহজ ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন এই বেদনায় তাঁর কবি-প্রকৃতি প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। 'এখন থেকে দ্বন্দ্বের, দুঃখ-বিপ্লবের আলোড়ন'—এই 'নতুন বোধের অভ্যুদয়'। রবীন্দ্র-কাব্যে এই পর্বের দান ভাবে ও ছন্দে ঐশ্বর্যময় অথচ সর্বাধিক মাধুর্যাভিষিক্ত।

কিন্তু এখানেও একটি অস্পষ্টতা রয়েছে। কবি-চেতনা বিশ্বজোড়া ইতিহাসের মধ্যে 'পাগলের' নৃত্য দেখে গতিবিমুগ্ধ আপনাকে তখনো সান্ত্বনা দিতে চান—সে পাগল ভয়ঙ্কর। 'সেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জ্বলিয়া উঠে।" ভয়ঙ্করের এই স্বীকৃতির মধ্যে—এমন কি 'পাপের' এই আবিষ্কারের মধ্যে কবিচিত্তের যতখানি বেদনাবোধ আছে, ততখানি বিরোধিতার শপথ তখনো নেই। কারণ, কবি জানেন, "এই 'খ্যাপা দেবতার' যখন পরিচয় পাই তখন রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।" অবশ্য 'বলাকা'র কাল থেকে আরম্ভ করে 'পূরবী' ছাড়িয়ে এ-বোধ ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিশ্বনৃত্য আর সহজ নেই। তাই ক্রমেই আর অত সহজে কবিচিত্তে তার প্রকাশও জেগে উঠতে পারল না—সত্য

সত্যই যখন মানুষের মধ্যে এই পাপ অসাধারণ আকারেই ক্রম-প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রতিভাও দিনের পর দিন স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল 'শান্তম্, শিবম্, সত্যম্'-এর গতি-পথ জীবন-যাত্রায় স্বচ্ছন্দ নেই, মানুষের ইতিহাস-মধ্যে 'শিবকে' এই দিনে অতি সহজে আয়ত্ত করবার অবকাশ নেই—অন্তত সে-মানুষের নেই যে-মানুষের দরদী এবং কবি হিসাবে সৃষ্টিকে যে জানে জীবন-ধর্মরূপে। কারণ, নিখিলকালে যা'ই সত্য হোক, অতি সত্য এই যে, আজ সভ্যতার সংকট-মুহূর্ত।

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গ-মন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

মনুমেণ্টের বেদিতলে নিয়ে দাঁড় করাল কবিকে হিজলির বন্দিশালার নিরস্ত্র বন্দিহত্যার প্রতিবাদে—

একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরি—

অন্তর মথিত করে জাগল 'প্রশ্ন':

ভগবান্, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে…
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

অতি সহজ ছিল যাঁর নিকটে একদিন এই সত্য—'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে', জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি অকুণ্ঠিত অন্তরেই স্বীকার করিলেন,

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।...

দেখলেন—

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,—
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

সেই জন্ম-রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ জানালেন :

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি—

ইতিহাসের মহৎ সত্য সেদিন সৃষ্টি-সন্ধ কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল : 'ওরা কাজ করে'।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।

যে-রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ বালকের মতো 'খেলিবার বাঁশী' নিয়ে বিশ্বজোড়া শান্তি-সুষমায় আপনার কবি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন, অশীতি বৎসরে পরিনির্বাণের মুখে এসে তিনি রেখে গেলেন তাঁর মোহভঙ্গের খেদ আর তাঁর শেষ আশ্বাস দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সম্মুখে :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব,...আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

সেই 'শান্তম্' আর নেই, আছে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। মানুষের প্রতি বিশ্বাসও বুঝি টেঁকে না? কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই বিশ্বাসের বনিয়াদ কি?—'ওরা

কাজ করে'। অপরাজিত মানুষের অভিযান। বিশ্ব-সংকটের মধ্যে দিয়েও রূপায়িত হচ্ছে মানুষের এই অভিযান :

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ....

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে শান্তি ও সুষমার আদর্শ এইরূপে ব্যক্তি-জীবন ও ধ্যান-লোকের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে ও বাস্তব সাধনায় মূর্ত হতে চেয়েছে। তাঁর কল্পনামুগ্ধ অধ্যাত্ম-চেতনা সুপ্রশস্ত মানবিকতায় এভাবে শেষ অবধি সংহত হয়েছে।

মহামানবের প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের নিকট তাই মানবিকতা শুধু যেমন নিষ্ক্রিয় আদর্শ বা সত্তার পারমার্থিকতা নয়, তেমনি মাত্র একটা নেতিবাচক আদর্শ বা হিংসা-বিরতিও নয়। মানুষে মানুষে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের পথে যা-কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করেছে—হোক তা জাতির, হোক তা বর্ণের, হোক তা ধর্মের, হোক তা অর্থের—রবীন্দ্রনাথের মতে তা-ই বর্জনীয়। এ সবলের বিরুদ্ধে সংগ্রামও মানবিকতার ধর্ম।

স্বভাবতই এই সংগ্রাম অনির্দেশ্য ভাববাদ মাত্র নয়। জীবনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যারূপে তিনি যেখানে তার সম্মুখীন হয়েছেন, সুনির্দিষ্ট বাণীতে তিনি তার বিরোধিতাও করেছেন।

ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সহজভাবেই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে প্রথমত ইউরোপীয় সভ্যতার পররাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় মানবিকতার প্রয়োজন তখনো জাতীয় স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদ তার করাল নখরদংষ্ট্রা নিয়ে তখন দেখা দিয়েছে ভারতে, চীনে, পারস্যে, নিগ্রো জাতির বিরুদ্ধে জঘন্য অত্যাচারে। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদ তখনো কবির চোখে অনেকাংশে একটা জাতীয় দম্ভ মাত্র। অবশ্য বুয়র যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি বুঝেছেন 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'। তবু সেই স্বার্থের স্বরূপ তাঁর নিকট সুপরিচিত নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের দিনে তাই 'বলাকা'র যুগেও তিনি আশা পোষণ করেছেন মানুষের স্বাভাবিক সমুত্থানের। কিন্তু 'ন্যাশনালিজমের' বক্তৃতাবলীতে দেখা যায় একটি সত্য তাঁর কাছে তখন স্পষ্ট—জাতীয়তা আপনার উৎকটতায় কেমন করে সাম্রাজ্য-বাদে পরিণত হয়। তথাপি তখনো তাঁর নিকট স্পষ্ট নয়—বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের যোগাযোগ, শোষণ ও শাসনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম'-এর মূল তত্ত্ব। সে-তত্ত্ব তখনো কবির নিকট কেন, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজ-নীতিবিদদের নিকটও অজ্ঞাত। বস্তুত সোবিয়েতের জন্মে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এ-তত্ত্ব ক্রমে বিস্তার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও তা গ্রহণ করিতে কখনো দ্বিধাবোধ করেন নি—তা তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি', নোগুচির নিকট লেখা চিঠি এবং মিস্ র্যাথবোনের নিকট

লেখা চিঠি থেকে স্পষ্ট। অবশ্য এ-কথা তিনি পূর্বাপরই উপলব্ধি করেছিলেন যে, যতক্ষণ সাম্রাজ্য-স্বার্থ প্রবল থাকবে ততক্ষণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংগ্রামও থাকবে; ততক্ষণ স্বাধীনতাকামী জাতিদের মুক্তি-সাধনাও নিষ্কণ্টক নয়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের অর্থই হিংসা, যুদ্ধ, শান্তির অপমৃত্যু, মানব-বিকাশের বিপত্তি। "মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ব্যাপ্ত তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের (যুদ্ধের) নিবৃত্তি হবে না।"

পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে বা স্বাধীনতার সংগ্রামকে কখনো তাই শান্তির প্রতিকূল বলেও জানেন নি। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' দেখে তিনি ক্ষুব্ধ। কিন্তু আনুষ্ঠানিক অহিংসাবাদ ও প্যাসিফিজমেও তাঁর আস্থা নেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যে বিশেষ পথটি গ্রহণ করতে চেয়েছেন সেটি বিশেষ করে 'আত্মশক্তির' উদ্বোধনের পথ, 'আবেদন-নিবেদনের' পথ নয়; সৃষ্টিমূলক জাতীয়সাধনার পথ, ধ্বংসমূলক বিদ্রোহের পথ নয়। এ রাজনীতিকে আমরা বলি সৃষ্টিমূলক রাজনীতি বা 'ক্রিয়েটিব্ পলিটিক্‌স।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহকে—ভাঙার দিককেও—গৌণ বা ভ্রান্ত মনে করেছেন। বলাবাহুল্য, কবির এ রাজনীতি পরবর্তীকালের 'গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্ম-তালিকা থেকে স্বতন্ত্র-জাতের—আদর্শেও বটে, পদ্ধতিতেও বটে তা স্বতন্ত্র।

কারণ, রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর মধ্যযুগের সামন্ত আচার-নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তিনি 'মানুষের অধিকারে' ('রাইটস অব ম্যান'-এ) বিশ্বাসী। মানুষের ব্যক্তি-সত্তা তাঁর কাছে পরম সত্যের স্বাক্ষর। তাই নারীর অমর্যাদা, জাতিভেদ বর্ণভেদ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—এ সবই তাঁর বিবেচনায় ঠেকেছে মিথ্যার অত্যাচার বলে জাতির অধঃপতনের কারণ: আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর! শুধু তাই নয়, তিনি আধুনিক যুগের শিল্প-বিজ্ঞানে আস্থাশীল, বিজ্ঞানের দানে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। অথচ এ সত্ত্বেও প্রাচীনের মোহ তাঁর মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল, তা নয়। প্রথমত, তিনি মনে করতেন ভারতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লী-সমাজের (ভিলেজ কমিউনিটি-র) ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, তিনি বুঝতে চান নি যে, এ-দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় শুধু সামন্তবাদী কুসংস্কার (জাতিভেদ, নারীর অপমান, আচার-নিয়মের দাসত্ব, ইত্যাদি) নয়, সামন্তবাদী ভূমি-ব্যবস্থাও;—কৃষকের বিপ্লবেই ভারতীয় বিপ্লব সমারব্ধ হতে পারে। তৃতীয়, একটা অর্ধসত্য ধারণাও তাঁর অনেকদিন পর্যন্ত ছিল-ভারতের মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তারা নির্জিত। "সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে আছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতি, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নাই।" কিন্তু পরবর্তীকালে এ-সত্য তিনি বুঝেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ এই

সামন্তযুগের অশিক্ষা-কুশিক্ষাকে পোষণই করে, তা পোষণ করাই তার স্বার্থ।

ফ্যাশিজমের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবন-দর্শন আরও বেশি বাস্তব ও স্বচ্ছ হয়ে উঠতে বাধ্য হল। আর ঠিক সেই দিক থেকেই সোবিয়েত রাশিয়া পরিদর্শন করে তাঁর সেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানবিকতা আরও বেশি দৃঢ় আশ্রয়ের সন্ধান পেল। রাশিয়ার মানব-প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে তিনি দেশে ফিরে এলেন ;—বুঝলেন মানুষের ইতিহাসে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছে। সে অভ্যুদয় শুধু 'মানুষের' নয়, সাধারণ মানুষের। তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্যের সংশয়জাল ছিন্ন করে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গর্কী বা রলাঁর মতো নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না ইতিহাসের এই 'নবজাতক'কে—সবল কণ্ঠে ডাক দিতে পারলেন না এই সাধারণ মানুষকে সভ্যতার উত্তরসাধকরূপে। জানালেন 'ওরা কাজ করে' ; জানালেন না—'ওরা' আর সভ্যতার ভার-বাহক মাত্র নয়, ওরাই সভ্যতার আজ উদ্ধারকর্তাও। তাই, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"—এই স্বীকৃতির মধ্যে যে-সংশয় আছে তা তিনি অতিক্রম করলেন মহামানবের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে—

ঐ মহামানব আসে···

এ মহামানব আসলে পৃথিবীর সাধারণ মানব—সেই যারা কাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে এ কথা ঘোষণা করতেও রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আর দ্বিধা থাকত না—যখন তিনি দেখতেন—এশিয়ার দেশে দেশে এই মুক্তি-সংগ্রামের প্রসার, তাঁর অতি-শ্রদ্ধার চীনে পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা, পূর্ব ইউরোপের বহু বিপর্যস্ত জগতে অবশেষে মানুষের মুক্তি ;—আর দেখতেন বিখ্যাত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মতো পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জুড়ে 'সাম্যবাদের সৃষ্টি-পরিকল্পনা,' এবং দেখে বুঝতেন সভ্যতার সংকট-মুহূর্ত অবশেষে বিশ্বশান্তির উদ্যোগ-মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ;—জগতের সাধারণ মানুষ আজ সত্যই অগ্রসর তার 'মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে'। সেইখানে তারাই বিশ্ব-মানবতার প্রধান কর্মী ও কবির সৃষ্টি-সাধনার প্রধান উত্তরসাধক।

সাধারণ মানুষের এই স্বীকৃতি বাঙলা সাহিত্যে কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ইতিপূর্বে অতি বিরল ছিল।

বৈশাখ, ১৩৬১ বাং

বাঙলা উপন্যাসের ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা উপন্যাসে বাঙালী লেখকেরা অধিকতর স্বচ্ছন্দ এবং অগ্রসর হইতে উন্মুখ হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বাঙলার এবার উপন্যাসের দিন আসিতেছে। আবার, বাঙলা উপন্যাস এই কালে অন্তত দুই একটি দিকে সচেতনভাবে পা বাড়াইতে চাহে। যেমন, প্রথমত বাঙলা উপন্যাস এ যুগে মহাকাব্যের মত একটা বিশালতা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়ত, বাঙলা উপন্যাস শুধু মাত্র ব্যক্তি-প্রধান জীবনচিত্র না হইয়া ঘটনা-প্রধান সমাজ-চিত্র হইতে চাহিতেছে। তৃতীয়ত, উহা একটা পরিবর্তমান পৃথিবীর এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিতে যত্নপর।

বাঙলা উপন্যাসের এই নূতন প্রকাশ ও প্রচেষ্টা কতটা স্থায়ী হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই 'উপন্যাসের দিন' একেবারে আকস্মিক আসে নাই—ইহার জন্য সামাজিক ও সাহিত্যিক ভূমিকাও ক্রমেই রচিত হইয়াছে। উপন্যাসের স্বরূপ ও বাঙলা উপন্যাসের সেই ভূমিকা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে মানুষ কতটা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ছোট গল্পের ধর্ম

বাঙলায় অবশ্য ছোট গল্পের সমাদর যথেষ্ট আছে। বরং সাময়িক পত্রের পরিমিত পরিসরের তাগিদে ছোট গল্পের চাহিদা আরও বাড়িবার কথা। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকও আবার ছোট গল্পের সার্থক লেখক। অনেকেই ছোট গল্পে হাত পাকাইয়া উপন্যাসে হাত দেন। কিন্তু কেহই তাই বলিয়া ছোট গল্প লেখা একেবারে ছাড়িয়া দেন নাই। নিতান্ত বাহ্য ও বাস্তব কারণেও তাহা ছাড়া সম্ভবপর হয় না। বাঙলা সাহিত্যের প্রধান বাহন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। মানুষের কাজের তাড়া বাড়িতেছে, ইহার মধ্যে অল্প সময়েও পড়া যায় ছোট গল্প। পাঠক তাই ছোট গল্প চায়। আবার অল্প সময়ে ছোট গল্প লেখাও যায়—লিখিতে জানিলে, আর তাহাতে যাহা কিছু হউক অল্প দক্ষিণা লেখকের হাতেও আসিয়া যায়—লেখকও তাই ছোট গল্প লেখেন। ছোট গল্পের স্রোত তাই ক্ষীণ হইবে না।

এই তাড়াহুড়ার দিনে ছোট গল্পের একটা বাজার আছে; তাহার চাহিদা কমে নাই, জোগানও তাই হইবেই। কিন্তু যে পাঠক তাড়াহুড়ার দায়ে মাসিকপত্র কিনে, গল্প পড়িয়া পাতা উল্টাইয়া যায়, সে-ও কিন্তু ছোট গল্পের বা খণ্ড কবিতার বই বাহির হইলে সে বই আর কিনে না, বই কিনিতে হইলে বরং কিনে উপন্যাস। কবিতা ও ছোট গল্পের বইএর অপেক্ষা বেশি বিক্রয় হয় এ যুগের নানা সাময়িক আলোচনা গ্রন্থ—বাঙলা

প্রকাশকেরা এই কথাই বলেন। ছোট গল্প ও খণ্ড কবিতা মাসিকপত্রের পাতায় জন্মে, সেইখানেই মরে—শিশু মৃত্যুর হার ইহাদের মধ্যে বেশি। ছোট গল্প ও খণ্ড কবিতা দুই মিনিটে পড়িবার মত জিনিস; উপন্যাস একটু বসিয়া পড়িতে হয়, —হয়ত শুইয়াও পড়িতে হয়। তাহার বাজার তাই পৃথক, তাহার চাহিদাও ভিন্ন রকমের। উহাও সময় কাটাইবার জন্য পাঠক চায়, কিন্তু সে সময়টা তাই বলিয়া দুই মিনিট নয়—অন্তত দুই চার ঘণ্টা—উপন্যাসের বিস্তার যাহাতে বুঝিতে পারা যায়। এ যুগে বাজারের দাবীকে তুচ্ছ বা বাহ্য বলা যায় না। সেই বাজারের দিক হইতে দেখিলেও বুঝা যায়—ছোট গল্পের আর উপন্যাসের বাজার ঠিক এক নয়।

ছোট গল্প আর উপন্যাস আসলে এক জিনিসও নয়। দুইই কথাসাহিত্য। একটা জায়গায় দুয়েরই মিল আছে, তাহার উপর দুই সাহিত্য-পথেরই অধিকার সমান। তবু গল্প আর উপন্যাস কথাসাহিত্যের দুই দেশ। ছোটগল্প বড় হইলেই উপন্যাস হয়, এমন নয়; উপন্যাসকেও টেব্‌লয়েড্‌ করিলেই ছোটগল্প হইবে, এমন নয়। আবার ছোট গল্পের বড় লেখকদের উপন্যাসের বড় লেখকদের অপেক্ষা কেহ ছোট মনে করেন না। মোপাসাঁ চেখব্‌ তাহার প্রমাণ। ছোট গল্পের রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা ছোট তো নহেনই, সম্ভবত বড়, —তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথ কবি

রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী, এই কথা বলিলেও ভুল হইবে না। বরং ছোট গল্প ও উপন্যাসে যে কতটা বড় তফাৎ আছে এই কথাতে তাহারও একটা ইঙ্গিত মিলিবে। ছোট গল্পের প্রেরণা ও উপাদান অনেকটা খণ্ড কবিতার মতো—জীবনের একটি কোণ, চকিতে দেখা একটি ঝলক, একটি খণ্ড ভাব, দৃশ্য, মুহূর্ত, ঘটনা, বা অমনিতর কিছু। খণ্ড কবিতার পিছনে যে জাতীয় সত্য থাকে ছোট গল্পের সত্যও তাহাই। (এই কারণে আধুনিক 'নিবন্ধ' বা Essay জাতীয় লেখাও উহাদেরই সগোত্র। অবশ্য উহাদের নিজস্ব প্রকাশ-কলা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র; কিন্তু ছোট গল্পের ও খণ্ড কবিতার প্রকাশ-কলায় মিলও আছে। ছোট গল্পের প্রয়োজন অন্তত একটি মূল জিনিস—লেখকের বাক্-সংযম রস ঘনাইয়া তুলিবার জন্য দরকার ঘন-সন্নদ্ধতা (Concentration) ও লেখার অখণ্ডতা (Unity)। ছোটগল্প ও খণ্ড কবিতা দুইএরই ছোট হওয়া চাই—তাহা বলা বাহুল্য। ছোট বলিয়াই তাহাদের চাহিদা। এই জন্যই বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও খণ্ড কবিতার প্রাবল্যও এত বেশি।

যে সামাজিক ও সাহিত্যিক সত্য এই জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় তাহা সত্য। মানুষের তাড়া বাড়িয়াছে, অল্প সময়ে সে একটা কিছু পড়িতে চায়, আনন্দ পাইতে চায়। তাহারই সহায়ে আবার জীবনের এক ঝলকও সে দেখিয়া লয়, একাংশ বুঝিয়া লয়। জীবনের তাড়া যত বাড়ে নানা দিকে

তত তাহার ডাক পড়ে, ছোট বড় নানা চঞ্চল ঘটনার টান্ লাগে মনে। তখন নানা মুহূর্তে, নানা খণ্ড ঘটনায়, খণ্ড দৃশ্যে, তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও মানুষ সচেতন হয়। খণ্ড কবিতা ও ছোট গল্প তাহার সেই ব্যক্তিত্বের খণ্ড খণ্ড সচেতনতাকে সুস্পষ্ট করে, এক-একটি ছোট বড় অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়, ব্যক্তিত্বের এক-একটি কোণকে উদ্ভাসিত করিয়া উপস্থিত করে। ব্যক্তির নব-জাগ্রত আত্ম-সচেতনতার প্রমাণ ছোট গল্প ও খণ্ড কবিতা। উহাই বাঙলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষ দশক হইতে প্রবল। কিন্তু মনে হয় তাহার মতই প্রবল রূপে বাঙলা সাহিত্যে এই বার আসিতেছে এক উপন্যাসের যুগ, ব্যক্তিকে এক-একটি বার বিস্তৃততর পরিবেশে বুঝিবার তাগিদ।

উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের তফাৎ তাই শুধু বাহ্য কলেবরের তফাৎ নয়; এমন কি গোষ্ঠীর তফাৎ নয়, সে তফাৎ এই ধর্মের তফাৎ। উপন্যাসের ধর্মও অবশ্য সূত্র সংহিতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায় না; সৃষ্টির দাবীতেই সেই ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার সৃষ্টির দাবীতেই তাহার অদল বদলও চলিতেছে। মোটামুটি তবু উপন্যাসের নিজস্ব রূপ এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রথমেই দেখি—উপন্যাসও কথা সাহিত্যের এক দেশ। অর্থাৎ তাহাতে কথা বা "গল্প" থাকিবেই। গল্পের লোভ খুব সনাতন। সাহিত্যের সব চেয়ে পুরাতন দেশ 'কথা'; উপন্যাস তাহার এক নূতন আবিষ্কৃত

ভূমিভাগ। “গল্পাৎ পরতরং নহি”—এইটা সেকালের আমাদের পূর্বপুরুষদের মত কে বুঝিয়াছিলেন? কথায় কথায় তাঁহাদের উপাখ্যান আরম্ভ হইত। বেদেও গল্প বাদ যায় নাই; তাহার পূর্বেই লোক-কাহিনী জমিতে ছিল। মহাকাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক অজস্র উপাখ্যান গ্রথিত হইয়া আছে। সর্ব্বদেশের প্রাচীন গ্রন্থেই অবশ্য এইরূপ গল্পের সংগ্রহ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেতো কথাই নাই। ‘বৃহৎকথা’ হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা ‘কথাসরিৎসাগর’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘কাদম্বরী’ প্রভৃতিও ঐরূপ নেশাতেই লিখিয়াছি। এমন কি, রাজনীতির সূত্র পর্যন্ত “হিতোপদেশ” “পঞ্চতন্ত্রের” গল্পে ঢালিয়া আমরা উপাদেয় করিয়া লইতাম। মানুষের গল্পের নেশা বরাবরকার। সূর্য চন্দ্র লইয়া পর্যন্ত সে গল্প রচনা করিত; ‘মিথ-লিজেণ্ট’এর নানা স্তর পার হইয়া তাহা সাহিত্যে পৌঁছায়।

গল্পের নেশার কারণ এই: খণ্ড ঘটনার মধ্যে বারবার মানুষ এক-একটা সূত্র আবিষ্কার করিতে চাহে। তাহা পাইলে জীবনের ছোট বড়, টুকরা টুকরা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের একটা অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে মিলাইয়া জীবনের খানিকটা দেখা যায়, উহা বুঝা যায়। জীবন শুধু একটা অর্থহীন প্রবাহ মাত্র নয়। যাহা ঘটে, যাহা মানুষ করে তাহার একটা অর্থ আছে. তাহা শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাহার একটা অখণ্ড দিকও আছে।

ঠিকমত তাহার সূত্র বুঝিলে, আবেষ্টনী আবিষ্কার করিতে পারিলেই এই রূপ দেখা যায়। গল্পে মানুষ এই সূত্র ও আবেষ্টনী দিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতাকে লাভ করে। এই জন্যই মানুষ গল্প শুনিতে চায়, এই জন্যই গল্প বলে। গল্পের নেশারও মানে ইহাই। জানিয়া না-জানিয়া এই গল্পের মধ্য দিয়া সকলেই খোঁজে জীবনের অর্থ, একটা বিশ্ববীক্ষা, কোনো একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট জীবনবোধ বা criticism of life. অর্থ প্রকাশ করিলেই কথা সার্থক হয়।

অবশ্য উপন্যাসেরও উপকরণ এই গল্প—কথা বা আখ্যান। নাটকের অবলম্বনও মূলত তেমনি আখ্যান—গল্প।—এযুগের পরিভাষায় গল্প নাটক ও উপন্যাসের এই গ্রথিত ঘটনাকেই বলে 'প্লট'; আর উহা নির্মাণ-কলায়, ঘটনার ঝাড়াই-বাছাইতে, ফুটিয়া উঠিবেই খাঁটি ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি তাহার বিশ্ব-বীক্ষা, 'প্লটে'ও তাহা অনুস্যূত থাকিবে।

উপন্যাসের জন্মকাল

কিন্তু উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য শুধু গল্প নয়, প্লটেও শুধু নয়। উপন্যাসের উপজীব্য মানুষ আর ঘটনা, একসঙ্গে দুইই (নাটকেরও তাহাই)। উহার অর্থ—মানুষ আর তাহার পরিবেশ এবং এবং এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাত। বাহিরের দিক হইতে নানা মানুষের নানা কাজ ও ঘটনাবলীকে আমরা

কোনো সূত্রে গাঁথিয়া দেখিলে তৈরী করি গল্প বা প্লট। আর ব্যক্তির দিক হইতে মানুষকে যখন সেই ঘটনাবলীর মধ্যে দেখি, তখন দেখি ঘাত-প্রতিঘাতে সেই মানুষ বিশিষ্ট হইতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে, গড়িয়া উঠিতেছে, নতুন হইতেছে। মানুষকে তখন দেখি বিশিষ্ট ভাবনার ও আচরণের মানুষ হিসাবে। অর্থাৎ দেখি তার 'চরিত্র'। উপন্যাসের প্রধান কাজ শুধু ঘটনাবলীর চিত্র উপস্থিত করা নয়, বরং সৃষ্টি করা এই 'চরিত্র'। ঘটনাবলীর সহিত যেখানে মানুষের সম্পর্ক এইরূপ সক্রিয় হয়, সেখানেই মানুষ এইরূপ 'চরিত্র' হইয়া উঠে,—মানুষ বিশিষ্ট হইয়া ব্যক্তিত্ব লাভ করে, হয় ব্যক্তি-মানুষ। উপন্যাস বিশেষ করিয়া এই মানুষকেই ফুটাইয়া তুলিতে চায়।

তাই যে যুগে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্পষ্ট হয়, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক ধরা পড়ে, সে যুগেই সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দেয়। সভ্যতার গোড়ার যুগগুলিতে সমাজ এত জটিল হয় নাই, তখন মানুষের সাধারণ গুণগ্রামগুলিই জীবনযাত্রার পথে যথেষ্ট ছিল, তাহাই সাধারণভাবে বিকাশ লাভ করিত। সেদিনকার সমাজে মানুষে-মানুষে আদান-প্রদান চলিত কয়েকটা ধরাবাঁধা নিয়মে, মোটা সূত্র ধরিয়া। যেমন, কেহ প্রভু কেহ দাস, কেহ স্বামী কেহ স্ত্রী, কেহ শাসক কেহ শাসিত,—এইরূপই ছিল তখন সমাজ। মানুষও ছিল এইরূপ—এইরূপে পরিচিত। ইহার মধ্যে কেহ একটু বেশি প্রভুভক্ত হইত কেহ

একটু কম; কেহ বা হয়ত একটু বেশি ভ্রাতৃবৎসল কেহবা তাহা নয়; এইরূপ কমবেশি তারতম্য ঘটিতে পারিত, তাহাই ছিল মনুষে-মানুষে পার্থক্য। কিন্তু জীবনে তখন বৈচিত্র্যের অবকাশ অল্প, মানুষেয় বিভিন্ন দিকের ও বিচিত্র গুণেরও প্রকাশের সুযোগ নাই। মানুষের বৈশিষ্ট্য তখন তাই ঘুমন্ত পড়িয়া থাকিত—বিশিষ্ট মানুষ বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে সচেতন হইতে পারিত না। মানুষের সেদিনকার মূল প্রবণতাগুলি সুচিহ্নিত। তখনকার মহাকাব্যে, গাথায়, এমন কি রূপকথায় পর্য্যন্ত তাহাই দেখি; সেখানে মানুষকে পাই টাইপ-রূপে, বর্গ-চরিত্ররূপে। তবু ব্যক্তিত্বে আভাস, বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত, তখনো দুই একটি চরিত্রে লাভ করা যায়। যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনের মত পার্থক্য শুধু নয়, বুঝিতে পারি—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সহজ মানুষ ছিলেন না। সীতা সাবিত্রী যেমনই হোন্, দ্রৌপদীর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আভাস আছে। অর্থাৎ অসাধারণ মানুষ তখনো ছিলেন, তাহা লক্ষ্য না করিয়া বেদ ব্যাসের উপায় ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ তখন ছিল না, সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনও ছিল না। সে প্রয়োজন আসিল পরবর্ত্তী কালে—যখন সমাজ আরও অগ্রসর হইয়াছে। তখন প্রত্যেকেরই বিকাশের তাগিদ আসিতেছে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বতন্ত্র শক্তি আবিষ্কার করিতেছে—মানুষ আর ধরা-বাঁধা মানুষ নাই—'ব্যক্তি' হইয়া উঠিয়াছে, বিশিষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে ; তাহার পরিবেশ বিচিত্র, তাহার জীবন বিচিত্র। এইরূপে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে মানুষ যখন সচেতন হয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সন্ধান যখন মানুষ লাভ করে, সাহিত্যে তখনি উপন্যাসের জন্ম হয়। সমাজের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে যতই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয় ততই তাহার চরিত্র ফুটিয়া উঠে। চরিত্র বা মানুষ যখন ঘটনা-সন্নিবেশ বা প্লটের উপরে মাথা তুলিয়া উঠে, তখন উপন্যাসও তাহার প্রধান বিষয়বস্তুর খোঁজ পায়।

নাটকের ক্ষেত্রে

চরিত্র অবশ্য নাটকেরও প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু নাটকের আর উপন্যাসের তথাপি মূলগত তফাৎ আছে। নাটক দেখিবার জিনিস, শুনিবার জিনিস নয়, পড়িবার জিনিস তো নয়ই। নাটক সাহিত্যের এলাকা হইতে যাত্রা করিয়া অন্য এলাকায় গিয়া স্থান করিয়া লয়। তাহার স্বাধীনতাও এ রাজ্যে কম। তাহার প্লট সীমাবদ্ধ। তাহার প্লট রচনা-কৌশল আর উপন্যাসের প্লট রচনা-কৌশলও স্বতন্ত্র। নাটক আসলে কর্ম-প্রাণ, তাহার মূল ধর্ম action. কিন্তু উপন্যাসের প্রাণ চরিত্র ; কর্ম, কল্পনা, নানা ছোট বড় ঘটনার মধ্য দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে। কর্ম উপন্যাসের প্রধান আশ্রয় নয়। কিন্তু নাটকীয় চরিত্রের প্রধান আশ্রয় এই কর্ম, action নাটকের প্রাণ। যেখানে কর্ম সর্বাপেক্ষা প্রকট, কর্মবলে জীবন বা ঘটনাস্রোত সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ

করিতেছে, সেখানেই নাট্যকার নাটকের উপযুক্ত ক্ষেত্র দেখেন। সেই ক্ষেত্রের মানুষ, ঘটনাবলী, সেই কর্মময় জীবন-সত্যই, নাটকের উপাদান। তাই যেখানে কর্ম সুপ্রকট, সেইরূপ কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সংঘাতের মুহূর্ত মাত্র নাটক গ্রহণ করিতে পারে—বাকী অনেকটা ঘটনাই ঘটে নেপথ্যে। এই কারণেই আবার চরিত্র চিত্রণে নাটকের কৌশল ও লক্ষ্য স্বতন্ত্র। এক একটি ছোট বড় সংকটের 'লগ্নের' (situation) মধ্যে মানুষকে সে তুলিয়া ধরে—সেই সংকটের মধ্য দিয়া কর্মময় মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাহার ব্যক্তিত্ব যেরূপ প্রকাশিত হয় তাহাই উপস্থিত করে। তাই, "টাইপ"-চরিত্র লইয়াও সেকালে নাট্যকার নাটক রচনা করিতে পারিতেন—দেখিতে হইত সে টাইপ কর্মকুণ্ঠ না হয়। সংকটের 'লগ্নে' একটি মানুষের ধরা-বাঁধা মানসিক প্রবণতা যেরূপ ফুটিয়া উঠিত তাহাই তখনকার দর্শক ও লেখকের পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু যখন হইতে সমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব একটা বড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে নাট্যকার আর "ব্যক্তি-চরিত্র" না আঁকিয়া পারেন না—তাহা না হইলে নিজেও তৃপ্ত হন না। তথাপি নাটকে তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে তত স্বাধীনতা নাই—কারণ শুধু কর্মের মধ্য দিয়া যতখানি চরিত্র ফুটিয়া উঠে ততখানিই চরিত্র অঙ্কন সম্ভব; এবং চরিত্রের বিশেষ স্ফুরণমুহূর্ত গুলিকেই (crisis) মাত্র নাট্যকার দেখাইতে পারেন। কারণ ঘটনার বিশেষ সংকট

লগ্ন বা ক্ষণটি তিনি বাছিয়া লন। আর তাই তুলিয়া ধরেন কর্মচঞ্চল মানুষকে,—তেমন মানুষের চরিত্র বিশেষ স্ফুরণ-মুহূর্তটিতে তাহার কথা, কাজ, ভাবভঙ্গীর মধ্য দিয়া নাট্যকার উপস্থিত করেন। নাটকে অনেক ঘটনাই ঘটে নেপথ্যে, তেমনি নাট্যচরিত্রেরও অনেকটা অংশই বলা হয় আভাসে। কিন্তু নাটক শুধু নাট্যকারের কলা নয়—কলা-সঙ্গতি। নাট্যকারের যাহা আয়ত্তের বাহিরে থাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয় অভিনেতা জীবন্ত ভাবভঙ্গী সংযোগ করিয়া, প্রযোজক সুস্পষ্ট পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করিয়া—ফলে কর্মচঞ্চল জীবন পরিস্ফুট হয়, চরিত্রও মূর্ত হইয়া উঠে।

অবশ্য নাট্যকলার যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল এই যুগে সিনেমা ও সবাক্ চিত্র তাহা অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছে। জীবনকে নানাভাবে দেখাইবার নানা কলা-কৌশল এই দুই কলা আয়ত্ত করিয়াছে। ইহাদের মতে কিছুই নেপথ্যে ফেলিয়া রাখিবার দারকার নাই। ফেলিয়া রাখেও না। পরিবেশকে সম্পূর্ণ রূপ দিবার সামর্থ্য এই দুই নতুন কলা আবিষ্কার করিয়াছে—প্লটের জটিলতা, পরিবেশের নিখুঁত চিত্র, সংলাপের সৌন্দর্য, সবই ইহারা দিতে পারে। তবু ঠিক মতো দেখাইতে পারে না একটি গুরুতর সত্য—মানুষের অন্তর্জীবন। চরিত্রের রূপদান অবশ্য করিতে পারে—নাটকের অপেক্ষাও সেদিকে সিনেমার স্বাধীনতা অনেক বেশি। কারণ ঘটনা ও মানুষকে সিনেমা

নেপথ্যে ফেলিয়া রাখে না, সম্মুখে আনিয়া দেয়। কিন্তু মানুষকে উহারা চিত্রিত করে বাহির হইতে টানে টানে; উহাদের কৌশল প্রধানত ঘটনার মধ্য দিয়াই মানুষের মনকে দেখা। এইখানেই উপন্যাসের নিকটে উহাদের হার মানিতে হয়। উপন্যাস মানুষকে একেবারে ভিতর হইতেও দেখিতে পারে আবার বাহির হইতেও দেখিতে পারে; তাহার চক্ষে মানব-জীবনের কোনো জিনিসই নেপথ্যে থাকে না; কোনো ভাব, কল্পনা, কিছুই অদৃশ্যে ঘটে না। ঔপন্যাসিক সর্বগামী ও সর্বদ্রষ্টা—যদি তাঁহার সত্যই চোখ থাকে।

উপন্যাসের প্রকাশ-শক্তি

এই ভাবেই এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের পর হইতে উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছে সভ্যতার মহাকাব্য, তাহাতেই সমস্ত যুগ আজ সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। সিনেমা ও সবাক্‌চিত্র পারি-পার্শ্বিককে আরও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে—উপন্যাসের অপেক্ষাও বেশি শক্তি উহাদের সেই দিকে,—কিন্তু মানুষ ও ঘটনার সক্রিয় সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করিতে উপন্যাসের জুড়ী নাই। অন্য শিল্পকলায়ও জীবনের দুই একটা দিক উপন্যাসের অপেক্ষা বেশি উদ্ভাসিত করা যায়, কিন্তু মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে ও নানাদিক হইতে প্রকাশিত করিতে পারে এই যুগে একমাত্র উপন্যাস। তাহার বিষয়-বস্তু শুধু মানুষ ও তাহার পরিবেশ

নয়, সমগ্র মানুষ—তাহার অন্তর্জীবন, বহির্জীবন, সব কিছু। উপন্যাসের প্রকাশকলাও এইজন্য বিচিত্র। অন্যান্য শিল্পকলা যেন সেকালের পদাতিক বা অশ্বারোহী সেনা। জীবনকে, মানুষকে, তাহারা দেখে, আক্রমণ করে, আয়ত্ত করে বড় জোর জলে স্থলে। কিন্তু ঔপন্যাসিক 'তৃতীয় আয়তনের' যোদ্ধা, ঊর্দ্ধে থাকিয়া সব তিনি টুকিয়া লইতে পারেন। নায়ক নায়িকার অন্তর একেবারে অর্গলমুক্ত করিয়া ফেলিতে পারেন। অথবা, এ যুদ্ধে তিনি attack in depth চালাইতে পারেন। এমন কি নায়ক-নায়িকার নিশ্চিত নিবাসের মধ্যে পঞ্চমবাহিনীর মত মিলাইয়া থাকিয়া তাহার সকল তত্ত্ব পাঠককে জোগাইয়া দিতে পারেন। এক কথায় শিল্পে এমন freedom of movement আর কাহারও নাই। সেই স্বাধীনতা যে কত বড় তাহা বুঝিতে পারি এই বলিলে যে, এ যুগের ঔপন্যাসিক 'চতুর্থ আয়তনও আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে মিলিয়া মানুষের স্মৃতিক্ষেত্রে ও অনুভূতিক্ষেত্রে যে বিপর্যয় চলিয়াছে—সিনেমার অপেক্ষাও ঔপন্যাসিক তাহা ভালো করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। এই সত্যটা ঔপন্যাসিক স্টার্ণও সহজভাবে জানিয়াছিলেন। প্রুস্ত, জয়েস প্রভৃতি উহাকেই নানারূপে বড় করিয়া তুলিলেন। এক কথায়—এই যুগের মানুষকে সমগ্রভাবে প্রকাশের শক্তি আছে এক উপন্যাসের, উপন্যাসই সেজন্য এই যুগের মহাকাব্য।

ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি

এই সত্যই আধুনিককালে ঔপন্যাসিকরাও দিনে দিনে আবিষ্কার করিতেছেন। বাঙলা ঔপন্যাসিকও ক্রমশঃ এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই দিকে এই সত্যে পৌঁছানো সহজ-সাধ্য হয় নাই। কারণ, আমাদের সমাজে পুরাতন ঠাট, পুরাতন ব্যবস্থা একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই—'মানুষের অধিকার ও মানুষ তত স্থিরভাবে লাভ করিয়া উঠে নাই। সে অধিকার সম্বন্ধে অবশ্য আমরা সচেতন হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের দান

মানুষের অধিকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইয়া উঠি ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে। পুরাতন মোটা-মোটা লেন-দেনের সম্পর্ক তাহার পূর্বেই নতুন ধনিকতান্ত্রিক সভ্যতার আঘাতে ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকদল জীবনক্ষেত্রে আমাদিগকে আবার একটা আধা-সামন্ত যুগের জের টানিতেও বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের রাজা-রাজড়া, জমিদার-পিয়াদা এই সবের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের, বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের, সুযোগ তো বেশি নাই। কেরানি হইবার সুযোগ ছিল—তল্পিদার হইবার ডাক পড়িয়াছে। সেই জন্যই ধনিকতন্ত্রের

প্রদত্ত শিক্ষালাভেরও খানিকটা প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই, আমাদের পক্ষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, 'মানুষের অধিকারের' মন্ত্র জীবনক্ষেত্র হইতে সুলভ হয় নাই—বেশি লাভ হইয়াছে ইংরেজ সাহিত্যের মারফতে। বাঙালী উপন্যাসের ইতিহাসও তাই আরম্ভ হয় বাঙলার প্রথম বি-এ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে—উহা ছাড়া যে আর একটি মাত্র দেশী প্রতিভা উল্লেখযোগ্য—ভারতচন্দ্র নয়, মুকুন্দরাম। মুকুন্দরাম অন্ততঃ খানিকটা মানুষ দেখিয়াছিলেন, অন্যেরা দেখিতেছিলেন দেবদেবী, আর তাহাদের ভক্তদের। সে সব মানুষ সে যুগের বর্গগত মানুষও নয়, প্রায়ই ছায়া-মানুষ। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের সম্পর্কে আসিতে 'মানুষের অধিকার' ও মর্যাদা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমরা আবিষ্কার করিলাম—মানুষকে; বিচিত্র মানুষ সে, বিশিষ্ট প্রত্যেকেই, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই বোধেই বঙ্কিমের প্রতিভা বিকশিত হয়। বঙ্কিম কবিতা লিখিতেন বাজে; কিন্তু তাঁহার মনে কবিত্ব ছিল। উহার প্রমাণ কপালকুণ্ডলার মত কাব্যধর্মী কথা। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা আসলে ঔপন্যাসিক প্রতিভা। তাঁহার আসল শক্তি ঘটনা ও মানুষের সম্পর্ক বর্ণনায়, অর্থাৎ, গল্প বলায় ও চরিত্র চিত্রণে। তথাপি লক্ষ্য করিতে পারি—আমাদের দেশে মানুষ তখনো জীবনের দেনা-পাওনার সম্পর্ক হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

মধ্যযুগের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়

এক দিক হইতে উহাতে বাধা ছিল আমাদের পুরাতন পরিবার-কেন্দ্র জীবন-যাত্রা, এবং উহারও পিছনকার বহু পুরাতন আচার অনুষ্ঠানের বাঁধন, প্রাচীন সমাজের সমষ্টি কর্তৃত্ব। পূর্বকালে ব্যক্তির পক্ষে এই সমাজ শাসন, আচার নিয়ম নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া চলাই ছিল ধর্ম। ইহার মধ্যেও এই দেশে ব্যক্তির যে স্বাধীনতা ছিল না তাহা নয়—সে স্বাধীনতা ছিল সমাজের বাহিরে চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বা সাধু-সন্ত হইলে। না হইলে সে স্বাধীনতা কার্যক্ষেত্রে ছিল না, চিন্তার ক্ষেত্রে থাকিত। তত্ত্ব-বিচার ও দার্শনিক মত পোষণে এ দেশের 'মানুষের স্বাধীনতা' অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সেইরূপ বৈদান্তিক, এমন কি শূন্যবাদী বা নাস্তিক পণ্ডিতও সামাজিক আচার নিয়ম, সমাজ-শাসন অবজ্ঞা করিবার কথা ভাবিতে পারিতেন না, তাহা মানিয়াই চলিতেন। কাজেই বরাবরই এই দেশের ব্যক্তিসত্তা যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল তাহা সমাজের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের পথ নয়, সক্রিয় বাস্তব সম্পর্কের পথ নয়, মানসিক সঞ্চরণের পথ; বিষয়গত (objective) স্বাধীনতার পথ নয়, বিষয়িগত (subjective) স্বাধীনতার পথ। ইহার ফলে অনেক দেশের মত এই দেশেও দুইটি লক্ষণ দেখা যায়—চিন্তার স্বাধীনতা ও বাস্তব স্বাধীনতায় একটা ভাগ টানিয়াই এক দল জীবন-সংগ্রামে পাশ কাটাইয়া যাইতে চান, আর এক দল

সামাজিক চাপ কাটাইয়া নানা সাধু-সন্তের সহজ পন্থায় ভিড়িয়া পড়েন। সমাজের আচারগত বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজকে তাঁহারাও আঘাত করেন না, প্রভাবান্বিতও করেন না। কিন্তু যেই কথাটি এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে স্মরণীয় তাহা এই—এই দেশে মানুষ ব্যক্তিত্বের একটা সীমাবদ্ধ স্ফুরণের ক্ষেত্র পাইয়াছিল—নিজ অন্তর্মুখিতায়। আপনার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মানুষ এদেশে সচেতন হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইত না। বরং ঐ সব আচার নিয়মকে বাহ্য জ্ঞান করিয়াই পালন করিত, বা জীবনক্ষেত্র হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া অন্তর্মুখী হইত, আধ্যাত্মিক রসে ডুবিয়া যাইত।

ধারাটা কিন্তু পুরাতন, একেবারে উপনিষদের কাল হইতে তাহার প্রারম্ভ লক্ষ্য করা যায়। এবং ধারাটা এদেশের পক্ষে খুবই সহজ—তথাপি একান্ত নিজস্ব নয়। মধ্যযুগের রামানুজ, কবীর, দাদূ প্রভৃতি বা সহজিয়া, আউল, বাউল প্রভৃতিদের কথাটা যখন বলি,—বলি উহাই 'ভারতীয় সাধনা', তখন ভুলিয়া যাই—মধ্যযুগের অন্যান্য সমাজে, ইউরোপের খ্রীষ্টান মিষ্টিক্‌দের মধ্যে, ইরানের সূফীবাদে,—অনুরূপ চিন্তা ও জীবনদর্শন জন্মলাভ করিয়াছিল। সামন্তযুগের কঠিন বন্ধনের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা স্বাধীনতার পথ খুঁজিয়াছে এইরূপ অন্তর্মুখিতায়। সমাজ-দৃষ্টিতে উহা সামন্ততন্ত্রেরই একটা ফল। এবং এই অন্তর্মুখিতা স্বভাবতঃই গীতধর্মী, গীতিকবিতা তাহার ভাবাবেগের একটা প্রধান বাহন।

ইউরোপে ইরানে ভারতবর্ষেও তাহাই আমরা দেখিয়াছি। মধ্য-যুগের মানবতার বিদ্রোহ রূপ লইত এই বিদ্রোহীর রহস্যবাদে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ইংরেজ আমলে আমাদের ব্যক্তি-চেতনা যখন ফুটিয়া উঠিতেছিল তখন তাহার পক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে স্ফূরণের পক্ষে বাধা রহিল দুই ধরণের। একটা এই দেশীয় আচার-আচরণ ঐতিহ্যের বাধা, আর একটা সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাধা। আমাদের দেশে ব্যক্তি যখন আপনার স্বাধীনতা দাবী করিল তখন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকাশের পথ তাহার পক্ষে দ্বিগুণ বিঘ্নসঙ্কুল হইল। দেশীয় বাধা, বিদেশীয় বাধা, দুইই তাহাকে ঘিরিয়া রহিল; এবং ব্যক্তি চেতনার পক্ষে অন্তর্মুখী হইয়া উঠা সহজ হইল। তাই সে সময়ে সচেতন ব্যক্তি মানসিক ক্ষেত্রে যতটা সহজে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইল ততটা পরিবেশের সঙ্গে আপনার সক্রিয় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারিল না। এই জন্যই উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তাহার গোড়ার সত্য, তখনকার দিনে লেখকেরা ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছিলেন না। বঙ্কিমের পরে—রমেশচন্দ্রের পরে, যাঁহারা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন তাঁহারা যথার্থ উপন্যাস রচনা করিতে পারিলেন না। তখনকার একমাত্র সার্থক ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রনাথ। তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় স্বভাবগুণে অন্তর্মুখী কবি; তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, তাঁহার প্রতিভাও আসলে গীতধর্মী। উপন্যাসেও সেই দিকটাতেই তিনি বেশী জোর দেন যে দিকটা মনের দিক—'নষ্টনীড়' 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' বাঙলায় সাইকোলজিক্যাল উপন্যাসের যুগ সূচনা করে। ক্রমেই তাঁহার হাতে উপন্যাস এই অন্তরলীলা উদ্ঘাটনের পট হইয়া পড়ে; শেষে শুধু উপন্যাস নয়, মানুষ পর্যন্ত আইডিয়ার রূপক হইয়া উঠিতে থাকে। 'গোরা' হইতেই ইহার সূচনা হয়, শেষদিকের 'যোগাযোগের' কুমু পর্যন্ত ইহাই চলিয়াছে। গোরার প্রকাণ্ড প্রেক্ষাপটে জীবন সচল, মানুষ নিজের জোরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। উহার পরিকল্পনায় এক জীবনদর্শন পরিস্ফুট। আর এই জীবনদর্শন এত পরিষ্কার যে তাহার জন্য 'গোরা' উপন্যাসখানাও মনে হয় রূপকতুল্য—একটা আইডিয়ার ঘটনাময় চিত্র। সেই আইডিয়াকে 'ভারতবর্ষ' বা 'ভারত সভ্যতা' বলিতে পারি। এইরূপে আইডিয়া 'গোরাতে' এত বড় হইয়া উঠিতেছে যে তাহার প্রভাবে স্রষ্টা আর মানুষ দেখিতে চাহেন না, রূপক-চরিত্র সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। আনন্দময়ী, পরেশবাবু প্রভৃতি অপরূপ, কিন্তু রূপক। গোরা নিজে রূপক হইয়াও প্রাণবেগে মানুষ রহিয়া গিয়াছে। এই যে আইডিয়ার উপর ঝোঁক ইহা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসে আরও প্রকট হয়—'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগে'।

একেবারে শেষদিককার উপন্যাস রচনায় (মালঞ্চ, দুইবোন, লেবরেটরি) তাহা আবার সংযত হয়। কিন্তু কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অন্তর্মুখিতার ছাপ তাঁহার উপন্যাসেও রহিয়াছে—তাহাতেও চরিত্র ও ঘটনা তত মুখ্য নয়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁহার উপন্যাসে আছে সত্য, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছন্দ বা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। উপন্যাসের সত্য তাঁহার প্রতিভার পক্ষে সহজগ্রাহ্য ছিল না। 'গোরাই' সম্ভবত ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। উহাতে উপন্যাসের মহাকাব্যিক সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ স্পস্ট করিয়া তোলেন।

সাইকোলজিক্যাল উপন্যাস

ইহা ছাড়া আর একটি দিক—যেদিকে রবীন্দ্রনাথ দুয়ার খুলিয়া দেন—তাহা আমরা দেখিয়াছি। 'নষ্টনীড়', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' সেই দিকটির নির্দেশ দেয়। সাধারণ কথায় বলিতে পারি--ইহা সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের দিক। কোনো ঔপন্যাসিকই মানুষের মনকে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। শুধু ঘটনাচিত্রে উপন্যাস সৃষ্টি হয় না। 'চরিত্র' সৃষ্টি করিতে হয়। উপন্যাস-চরিত্রের একটা দিক বাহিরের, মানুষের বহির্জীবন। উপন্যাস-চরিত্রের আর একটা দিক তেমনি

ভেতরের, মনের দিক। এই বহির্জীবনের আঘাতে মানুষের চেতনায় নূতন সাড়া জাগে, মন সচল হয় ; বহির্জীবনকে মানুষ নিজের মতো করিয়া মানাইয়া লইতে চায়, আর নিজেকেও আবার বহির্জীবনের সঙ্গে খাপ খাওইয়া লইতে চায় ; পরিবেশও বদলায়, মনও বদলায়, পরিবেশকেও মন বদলায়। অন্তর্জীবনের এইরূপে চলে কখনো জানিয়া বিবর্তন, কখনো না জানিয়া, কখনো আধা-জানা আধা-অজানায়। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় বিষয় হয় তাহার কারণ তাহাদের এই মানসিক বিবর্তন। মানবের এই অন্তর্জীবনের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে ঔপন্যাসিক তুলিয়া ধরিতে পারেন। আর এই সুযোগ ঔপন্যাসিকের যেমন আছে তেমন আর কোনো শিল্পীর নাই। মানুষের মনকে তিনি ছোট বড় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আভাসে বাহির হইতে দেখাইতে পারেন ; একবারে সরাসরি নিজে তাহার ম্যাপ আঁকিয়াও দেখাইয়া দিতে পারেন, অন্যের মুখেও তাহার পরিচয় দিতে পারেন। একেবারে সম্মুখে বা পার্শ্বে আক্রমণ চালাইতে পারেন, পশ্চাদাক্রমণ করিতে পারেন, আর ভিতরের দিক হইতেও নিজে চিরিয়া চিরিয়া তাঁহার চরিত্রের মানস-জীবন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন ;— ফিফ্‌থ কলামের মত, উড়ন্ত জাহাজের ফটোগ্রাফারের মত, গোপনচারী মাইনের মতই তাঁহার শক্তি।

প্রথমাবধিই দেখা গিয়াছে, কোনো কোনো ঔপন্যাসিক

জোর দেন ঘটনা-সংবদ্ধ বহির্জীবনের উপর। যেমন, ফিলডিং। কেহ বা জোর দেন বিচিত্র মানসিক জীবনের উপর। যেমন, রিচার্ডসন। অবশ্য মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনকে আসলে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাই শুধুমাত্র ইহার কোনো একটি দিককে একান্ত করিয়া তুলিলেও উপন্যাস-চরিত্র ঠিকমত রূপলাভ করে না। আর চরিত্র সৃষ্টিই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে আবার সমাজ জীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যখন ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একই সময়ে উহাতে তুইটি বিপরীত লক্ষণও প্রকট হয়। মানুষের মর্যাদাই যখন বড় তখন এক দিকে ঝোঁক পড়ে সাধারণ মানুষকে সাধারণ হিসাবেই দেখিবার। অন্যদিকে ঝোঁক পড়ে ব্যক্তিস্বরূপের খোঁজে ব্যক্তিমনকে একান্ত করিয়া দেখিবার; সমাজ হইতে, পরিবেশ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার; তাহাকে শুধু মাত্র আবেগ-অনুভূতির (প্রধানতঃ যৌনকামনার) ক্রীড়নক বলিয়া গণ্য করিবার; তারও পরে ব্যক্তিকে শুধু মাত্র কয়েকটি সাময়িক ভাব ও আবেগ (mood)-মুহূর্তের আধার বা কতকগুলি স্নায়বিক আবেগ-সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিবার; কিংবা একেবারে অজ্ঞান-চৈতন্যের প্রবাহ বলিয়া তাহাকে বুঝিবার। অবশ্য এই সবই প্রকট হয় যখন ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ ও সুস্পষ্ট প্রকাশ আর ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্ভব হয় না। তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামেই ব্যক্তিত্বের এই বিভাগ ও বিনাশ চলে, মানুষের ভগ্নাংশকেই মানুষ বলিবার দাবী উঠে।

নাটকে উপন্যাসেও চরিত্র-চিত্রের অপেক্ষা একদিকে প্রমাণ-চরিত্র (আগেকার মত heroic type নয়, এ কালের standardised, average type, এমন কি, regimented ফ্যাশিস্ত টাইপ্) আঁকা শুরু হয়। অন্য দিকে চরিত্র-চিত্র অপেক্ষা শুরু হয় ভাবাবেগের (mood) মুহূর্তের চিত্র (লরেন্স, হাক্স্লি); স্নায়বীয় বা রক্তগত কামনা-আবেগের চিত্র (লরেন্স); চেতনা-প্রবাহের চিত্র (প্রুস্ত, জয়েস্, ভার্জিনিয়া উল্ফ্)। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক মনের অলিগলিতে ঢুকিয়া মানুষকেই খোয়াইয়া ফেলেন—'চরিত্র' আর আঁকিতে পারেন না। তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আজ ইউরোপে এই পরিণতি ঘটিতেছে। কারণ, সেখানে সমাজ আজ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চায়—রিচার্ডসন, থ্যাকারে হইতে তাহাদের এই ধারার সূত্র লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এই পথ খুলিয়া দেয়, তাহার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের বহির্জীবন অপেক্ষাও তাহার অন্তর্জীবন বেশি সত্য বলিয়া বোধ হইত।—তিনি অন্তর্মুখী কবি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে— রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্র অন্তর্জীবনকে শুধু মুহূর্ত-সমষ্টি, বা আবেগ-প্রবাহ, বা অজ্ঞানের খেলাঘর রূপে খণ্ড করিয়া দেখিতেন না। তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মানুষকে ভুলিয়া মানুষের মনকেই একান্ত করে নাই।

শরৎচন্দ্রের স্থান

বাঙলা উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ এইরূপে অগ্রসর করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ ঔপন্যাসিক নহেন, ব্যক্তি চরিত্রকে, মানুষকে ঘটনাবলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তাহাকে চিত্র করিবার জন্য তত সচেষ্ট হন নাই। তাঁহার সমকালবর্তী অপর কেহই বাঙলাদেশে বোধ হয় উপন্যাসের এই সত্য এইরূপে বুঝিতেও পারিতেছিলেন না। সেই তুলনায় শরৎচন্দ্র উপন্যাসের আসল সত্য বুঝিয়াছিলেন বেশি। এই জন্যই আবির্ভাব মাত্র বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন সুনির্দিষ্ট হইয়া গেল।

শরৎচন্দ্র যখন লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার পূর্বেই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব আমাদের নিকট বেশ স্পষ্ট হইতেছে। শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন—মানুষের চরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস; আর ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন সমাজের চারিদিককার মানুষ দেখিয়া। তিনি দেখিলেন, নূতনকালের নূতন ঘটনার সংঘাতে কিভাবে সেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব সাড়া দিতেছে; কি ভাবে ঘটনা বিপর্যয়ে, পরিবেশের আঘাতে, মানুষের নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে, মানুষ বিচিত্র হয়, বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে সমকালীন জীবনের এই সত্যই প্রকাশিত হইল যে বাঙালীর জীবন জটিল হইতেছে। এমন কি,

আমাদের নিম্ন-মধ্যবর্তী সমাজের জীবনে পরে-পরে যে যে বিভিন্ন অঙ্ক তখন ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহাও অঙ্কের পর অঙ্কে প্রতিফলিত হয়—'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি' হইতে 'পথের দাবী,' 'শেষ প্রশ্ন,' বিপ্রদাস উপন্যাস বাঙালী সমাজের নিম্ন-মধ্যবর্তী শ্রেণীরই ইতিহাস।

সত্যান্ধ ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের মধ্যকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের মূল সত্যই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। নিজেদের সম্মুখের মানুষ ও পরিবেশের দিকে না তাকাইয়া তাঁহারা উপন্যাসের প্রেরণা খুঁজিতেছিলেন বিলাতী বইতে—বাঙলায় তাহার 'প্লট' ও চরিত্র গ্রহণ করিতেছিলেন (যেমন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) একটু অদল-বদল করিয়া, ভাবিলেন তাহাতেই সব হইবে। কিন্তু কোনো উপন্যাসের প্লট বা পরিবেশ সামান্য অদল বদল করিলে, সে উপন্যাসের চরিত্র আর ঠিক তেমনটি থাকা সম্ভব নয়। পরিবেশের পরিবর্তনে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য মানুষের চরিত্রও দেখা দিবে, তাহা দেখিতে না পাইলে মানুষকে মানুষ মনে হয় না। বাঙালী-পোশাকে বিলাতী প্লট ও বাঙলা-নামে সেই বিলাতী চরিত্র দুই দিক দিয়াই শুধু মূল ইংরেজি উপন্যাসকে পরিহাস করিতে লাগিল। এই

জন্যই তৎকালীন মহিলা ঔপন্যাসিকেরা (নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, অনুরূপা দেবী) অপেক্ষাকৃত সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের মাথায় অনেক সময় থাকিত প্রাচীন প্রথাকে নূতনকালে (অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে) সমর্থন করিবার ঝোঁক। তাঁহারা এই ঘাত-প্রতিঘাতই দেখিতেন, বুঝিতেন ; প্লটের নেশায় বিলিতী বই খুঁজিতেন না। ইহাদের পক্ষে তাই, সংকীর্ণ দৃষ্টিতে হইলেও, মানুষ দেখা সম্ভব হইত, ধারা-করা প্লটের ধার-করা চরিত্র লইয়া কারবার করিতেন না। ফলে, খানিকটা উপন্যাসের সত্য ইহারা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মোটের উপর উপন্যাসের মূল সত্যকে বুঝা, —এই সত্য-অন্ধতা,—ইহা শরৎচন্দ্রের শেষযুগেও অন্য বাঙালী লেখকেরা অনেকে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তখনো সমসাময়িক বিলাতী উপন্যাসের দিকেই নজর—আল্ডুস হাক্‌সলি, লরেন্স, আলেঁন, বিভালেঁ নিকল্‌স্, তাহার পরে জয়েস্, প্রুস্ত প্রভৃতির গল্প, ভাবভঙ্গী তাঁহারা বাঙলায় ঢালাই করিতে চাহিলেন। ইঁহারা কেহ কেহ সুলেখক, কিন্তু ঔপন্যাসিক নহেন—তাহার কারণ সত্যান্ধতা। আগের যুগের সেই প্লট-বায়ুগ্রস্ত ঔপন্যাসিকেরা তবু মোটের উপর দেশী পোশাকে প্লট তৈরী করিতে চাহিতেন। ইহাদের পক্ষে সে দায়ও রহিল না—কারণ, ইহারা শুধু মত, তর্ক, আলাপ (dialogue, opinions, essays) দেহ-মনহীন ও মনস্তত্ত্বকে করিলেন উপন্যাসের সর্বস্ব,—

ঐ দুই বস্তুর কোনো বিশেষ পোশাক দরকার হয় না, দেশীও না বিদেশীও না। হাক্সলির মত চতুর বিদগ্ধ নিবন্ধ বা লরেন্সের মত কাব্যাবেগময় আসঙ্গানুভূতির কথা এদেশে কেহ লিখতে পারেন নাই উপন্যাসের কানা-গলিতে ঘুরিয়া মরিয়াছেন।

কিন্তু এইখানে আমাদের চোখে পড়ে যে, এই নিরর্থক রচনার যুগ শেষ করিয়া বাঙলায় আজ একদল সার্থক ঔপন্যাসিক জন্ম লইয়াছেন, তাঁহারা বই পড়িয়া নয়, চোখে দেখিয়াই উপন্যাসের বড় সত্য চিনিয়া লইয়াছেন তাহাদের সমকালীন এই মানুষ, এই বাঙালী 'চরিত্রও' তাঁহাদের চোখের সম্মুখে দিনে দিনে—ইতিহাসের অনিবার্য ঘাত-প্রতিঘাতে—হইয়া উঠিয়াছে জটিল, বিচিত্র অদ্ভুত নানা অভূতপূর্ব আলোড়নে ও ভাবনায় আলোড়িত।

শরৎ সাহিত্যের সাক্ষ্য

সাহিত্যে আকস্মিক ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে। বাঙলা সাহিত্যে একটা বড় আকস্মিক ব্যাপার বোধ হয় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। হঠাৎ কোথা হইতে যে তিনি উদিত হইলেন তাহা যেন কেহই ভাবিয়া পাইল না। অবশ্য অনেকে আজ বলিতে চেষ্টা করেন—শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব তেমন আকস্মিক নয়। 'কুন্তলীন পুরস্কারের' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আগেই স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কোনো কোনো গল্প ও উপন্যাসও তিনি আবির্ভাবের আগেই বসিয়া লিখিতেছিলেন। এ সবই হয়ত সত্য কথা। কিন্তু তাহার এই সত্যটা অপ্রমাণিত হয় না যে, শরৎচন্দ্র যেদিন বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সেদিন সাহিত্যিক সমাজে কেহই তাঁহার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হইয়াছিল, তাঁহার উদয় অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। সত্য কথা বলিতে গেলে মানিতে হয়, শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক সমাজ প্রথম সংবর্ধনা জানান নাই, তাঁহাকে প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী পাঠক-সমাজ। তখনকার দিনের সাহিত্যিকরা প্রথম দিকটাই ভাবিয়া পান নাই—শরৎচন্দ্রকে লইয়া কি করা যায়। ততক্ষণে পাঠকসাধারণ তাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া স্বাগত করিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার পদে সাহিত্যিকদের আর

করিবার ছিল কি? শরৎচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। তারপরে তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতেও সাহিত্যিক সমাজের দ্বিধা রহিল না। কিন্তু তবু কথাটা সত্য—শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ছিল তাঁহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত, এবং সকলের নিকট আকস্মিক।

শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক-সমাজ এত সহজে গ্রহণ করিতে পারিল—আর বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিপদে পড়িলেন, ইহার পিছনেও কারণ ছিল। আর তাহা বুঝিবার মত। শরৎচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তাঁহার আশ্চর্য সৃষ্টিশক্তির প্রমাণ লইয়া। এই প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ইহা একেবারেই স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। পাঠক এক মুহূর্তে মানেন—এইতো মানুষ, আমাদের মত মানুষ, হাসি-কান্না, সবলতা-দুর্বলতা, সত্য-মিথ্যা, সব লইয়া আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই বন্ধু, 'জায়া পুত্র পরিবার,'—তাহারাই সকলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের পাতা হইতে কথা কহিয়া উঠিল। এমন জীবন্ত চিত্রকে স্বীকার না করিয়া উপায় আছে?

কিন্তু পাঠক-সাধারণ যত সহজে শরৎচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লইল সাহিত্যিক সমাজ তত সহজে তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না কেন? সৃষ্টির অমোঘ স্বাক্ষর তাঁহারাও নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু বাধা পাইতেছিলেন কোথায়? সেই কথাটিই বুঝিবার মত।

যে কারণে তখনকার বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের পক্ষে শরৎচন্দ্রকে প্রথমেই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ সম্ভব হয় নাই, সেই কারণেই আবার তখনকার বাঙালী পাঠক-সাধারণের পক্ষে শরৎচন্দ্রকে সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এই কথাটা হইতেই পরিষ্কার—তখনকার বাঙালী পাঠক-সমাজ ও তখনকার বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে একটা ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল। সাধারণ পাঠক বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের লোক—তখনো তাহাই ছিলেন, আজও তাহাই আছেন। বলিতে পারি, সাধারণ পাঠক আসলে বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। সাহিত্যিকেরাও সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত সমাজেরই লোক। উভয়েই কম বেশি ইংরেজ শাসনের ও ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফল। কিন্তু বাঙালী পাঠক-সাধারণ পুরাতন সমাজ ও পুরাতন জীবন-যাত্রাকে অনেকটা মোহ ও মায়ার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কার্যক্ষেত্রে তাঁহারও অবশ্য ইংরেজি আমল ও একালের ধনতন্ত্রের আদর্শকে মানিয়াই চলিতেন। কিন্তু পুরাতন সমাজকে নিজেরা ভাঙিয়া গড়িবার সুযোগ আমরা স্বাভাবিক ভাবে পাই নাই। আমাদের প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রাকে প্রবল আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিতেছিল বহিরাগত পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রা ;—উহা ধনিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদেরই প্রকাশ। তাই, আমরা নূতন জীবনযাত্রাকে মোটেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। বরং এই কারণে পুরাতন জীর্ণ জীবনযাত্রাকেই অনেক মিথ্যা মোহ

দিয়া বড় করিয়া দেখিতে চাহিতাম। সাম্রাজ্যবাদের অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় এমনিতর ভুল ঘটনা স্বাভাবিক। অথচ আমরা ইংরেজি শাসন ও ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার মারফতে ধনিকতন্ত্রের ব্যপকতর আদর্শ ও গভীরতর সত্যের সম্বন্ধেও সচেতন হইতে-ছিলাম। না হইয়া উপায় ছিল না—মিল্ পড়িয়াছি, বেন্থাম পড়িয়াছি, কোঁৎ পড়িয়াছি; ফরাসী বিপ্লবের মুক্তিবাণীও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। এরূপ স্থলে 'মানুষের অধিকার',—প্রাদেশিকতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা,—এই সব সত্যেরও মূল্য বুঝিতেছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন সমাজের টানও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এমন কি, আমাদের নূতন প্রাদেশিকতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধও সেই পুরাতনকেই সময়ে সময়ে মোহের আবরণে ঘিরিয়া মোহন ও বড় করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। বাঙলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনও উহার দৃষ্টান্ত। সে আন্দোলনের একটা দিকে ছিল যেমন স্বদেশী শিল্প গড়া, অর্থাৎ দেশীয় ধনতন্ত্রের গঠনের চেষ্টা; আর একটা দিকে ছিল তেমনি পুরাতনের পুনঃ প্রবর্তন, 'হিন্দু জাতীয়তা' গড়া, অর্থাৎ পুরাতন সামন্ততন্ত্রের জীবনাদর্শকে টিকাইয়া রাখা। সাধারণ পাঠকও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলেন—তাঁহার মনের একটা অংশে অনেক মোহ জমিয়াছিল তাঁহার পুরাতন সমাজের জন্য। কিন্তু তখনকার বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দ এই পুরাতনের মোহ হইতে অনেকটা মুক্ত ছিলেন

তাঁহারা ছিলেন নূতন জীবনযাত্রার পক্ষপাতী—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান উদ্গাতা। সমস্ত লেখকই আসলে এই পক্ষে থাকিবার কথা—ইহাই ছিল 'উন্নতির পথ'। গত শতাব্দীতে এই প্রগতির ধারার নাম ছিল 'উন্নতির', 'সংস্কারের' বা 'রিফর্মের' আন্দোলন। কিন্তু এই 'সংস্কার' চেষ্টাটা সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে আসে নাই ; আসিলে উহা আসিত সমাজ-বিপ্লবের চেষ্টা রূপে। এখন আসিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদের ছাড়-পত্র লইয়া একটা 'সংস্কার আন্দোলন' বা 'রিফর্ম ম্যুভ্মেণ্ট' রূপে। এই জন্যই উহা শিক্ষিত-সাধারণের নিকটেও অনেক সময়ে ঠেকিয়াছিল 'বিলাতিয়ানা' বলিয়া। তাই, বঙ্কিম এই 'সংস্কার' আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিতেছেন, বিবেকানন্দও তাহাকে বড় বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু কথাটা এই—মন্দগতি হইলেও উহার মুখ ছিল জীবন্ত কালের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার সমস্ত সৃষ্টি এই জীবন্ত কালের দিকেই বাঙালী পাঠককে আগাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। পাঠক-সাধারণ অবশ্য তাহাতে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছিল ; কারণ, সৃষ্টির তাগিদ সেদিকে, কালের গতি সেদিকে। কিন্তু পুরাতনের মোহও তাহাদের রহিয়া গিয়াছে। বরং রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা এবং তখনকার সংস্কারক দলের এই সক্রিয়তা ও প্রাধান্য পাঠকের মনের একটি কোণে এক বিক্ষোভ ও বিরোধিতারই সৃষ্টি করিতেছিল। সেই বিরোধের আবেগটুকুকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অবশ্য রক্ষণশীল কেহ কেহ

সাহিত্যক্ষেত্রেও করিতেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলেরা একে চাহিয়াছিলেন মূলত সৃষ্টি-গতির বিপক্ষে যাইতে; দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টিরও তেমন শক্তি ছিল না। কাজেই বাঙালী পাঠক-সাধারণের, মানে বাঙলার নিম্নে-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মনের একটি কোণে যে এক ন্যায্য-অন্যায্য বেদনা ও বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা কোথাও রূপ পাইতেছিল না। বরং রবীন্দ্রনাথের অনুগত সাহিত্যিক-সমাজ যতটা পুরাতন সমাজকে 'সংস্কার' করিবার জন্য উদ্যত ততটা সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন না। সে সমাজকে রবীন্দ্রনাথও যতটা আপনার বলিয়া জানিতেন ততটুকু আপনার বলিয়া মানিতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সে দিনে তাঁহারাই ছিলেন 'হাই-ব্রো।' অর্থাৎ মোটামুটি বলিতে পারি—বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন সংস্কারবাদীর প্রাধান্য, অথচ সেই সংস্কারবাদীরা ততটা সৃষ্টিতে সার্থক নন,—আর বাঙালী পাঠক-সমাজে তখনো পুরাতন সমাজের জন্য মোহ ও মমতা রহিয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল এমনিতর বাঙালী সমাজে। তাহার প্রথম দান—'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বউ', 'বড় দিদি'র মত সৃষ্টি। এক নিমেষে বাঙালী পাঠক-সমাজ দেখিলেন—এই সৃষ্টিতে মানুষই শুধু জীবন্ত হয় নাই, একেবারে তাঁহাদেরই আপনার মানুষ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন সমাজেরও পিছনে তো একটা করুণ মানবীয় সত্য ছিল, সাধারণ বাঙালীরা

তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না ;—শরৎচন্দ্র যেন সেই সত্যটিকেই একেবারে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। এই তো বিন্দু—তাহার আপন সন্তান নাই। আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের হিসাব লইলে তাহার মাতৃত্বের পরিতৃপ্তির পথ কোথায় ? বড় জোর কোনো 'অনাথাশ্রমে', কোনো 'সি-এস-পি-সি-এ'র প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু আমাদের অতি-পচা সামন্ত-সমাজের সেই অতি-পচা একান্নবর্তী পরিবারে তো তাহার মাতৃ-হৃদয়ের পরিতৃপ্তির একটা পথ ছিল। আর শুধু কি পরিতৃপ্তির পথ ছিল ? সেখানে সন্তানহীনা বিন্দুরও মা হিসাবে দাবী আছে, দায়িত্ব আছে ; এমন কি মা হিসাবেই অধিকারও পর্যন্ত আছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ তো ধনিকতন্ত্রের রাজত্ব ; অর্থাৎ ধনিকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, শতকরা পঁচানব্বুই জনের ব্যক্তিত্বের খর্বতা,—এই কথা হয়ত তখনো আমরা বুঝি নাই। কিন্তু তখনো বুঝিতেছিলাম পুরাতন সামন্ত-সমাজে, একান্নবর্তী আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, যাহা আছে সবই কেবল ভুল আর অন্যায় নয়—সেই জীবনের স্বপক্ষেও দুই-একটি কথা বলিবার আছে। যে সেই সমাজ সত্যই দেখিয়া'ছ, সে তাহাও মর্মে মর্মে জানে। যে সেই সমাজেরই একজন—আমাদেরই একজন—সে-ই তাহা প্রকাশও করিতে পারিবে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল। আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী,—

বাঙালী "পাঠক-সাধারণ", Common Reader,—এক নিমিষে আমরা বুঝিলাম—নূতন স্রষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে, আর সেই নূতন স্রষ্টা আমাদেরই আপনার লোক। তৎকালীন বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দের হয়ত ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়াছিল—সংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতা পুষ্ট হইতেছে। নূতন সৃষ্টির এই অভ্রান্ত পরিচয়ে তাঁহাদের প্রাণেও আনন্দ সঞ্চারের কথা। তাহা সঞ্চার হইয়া থাকিলেও সেই ভ্রূকুটিকে তখন উহা মুছিয়া দেয় নাই, সেই ললাটকে তখন উদ্ভাসিত করিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাবে এই জন্যই বাঙালী সাধারণ পাঠক এতটা উল্লসিত হইয়া উঠেন। যে কথাটি বলিবার ছিল, সে কথাটি বলা হইল। শরৎচন্দ্র প্রথম উপস্থিত হইলেন এই কথাটি বলিয়া—না, এ পচ-ধরা বাঙালী সমাজেও মানুষ আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে, ক্ষতি আছে, বেদনা আছে, কিন্তু মানুষও তবু এইখানে ঠাঁই পায়, ফুটিয়া উঠিতে পারে। 'হালদার' গোষ্ঠীর' সামন্ত-জীবনের কাঠামো ভাঙিয়া না বাহির হইলে বনোয়ারীলাল ফুটিতেই পারে না। কিন্তু 'নিষ্কৃতির' মুখুজ্জে পরিবারের মানুষগুলি সকলকে জড়াইয়া থাকিয়াও মানুষ হইয়া উঠে—ইহা কি কম সত্য?

অথচ ইহাও অর্ধসত্য। আর তাহা আমরাও জানিতাম, শরৎচন্দ্রও জানিতেন। যেই কথাটি আমাদের প্রাচীন সমাজের স্বপক্ষে বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইতে না-হইতেই

শরৎচন্দ্রের ঘোষণা-বাণী তাই জ্বলন্ত অক্ষরে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তখনো 'সংস্কারকের' বাঁধা-বুলিতে প্রাচীন সমাজকে তিনি আঘাত করিলেন না—বিপ্লবীর মতই তিনি দুর্বার শক্তিতে আঘাত করিলেন। 'পল্লী-সমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' হইতে একেবারে 'গৃহদাহ' পর্যন্ত বলিতে পারি শরৎচন্দ্রের এই স্পর্দ্ধিত বিদ্রোহের ধারাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার নূতন গল্পে ('সবুজপত্রের' পাতায়), লেখায়, ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'সবুজপত্রে' বাঙালী-জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে চরম প্রচার চালাইতেছিলেন। (তাই সমাজ ও সাহিত্যেরও ইতিহাসে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার নামে যুগ-চিহ্নিত করা যায় না—'কল্লোলে'র নামে ত না-ই, 'পরিচয়ে'র নামেও সম্ভবত না—প্রসঙ্গক্রমে তা স্মরণীয়)। কিন্তু 'সবুজপত্রের' সেই মন্ত্র আমাদের সাধারণ পাঠকদের যতটুকু স্পর্শ করুক না করুক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে আমরা সম্পূর্ণ অভিনন্দন করিতেছিলাম। তাহার কারণ কি ? প্রধান কারণ, উহা সৃষ্টি ; মানুষের স্বীকৃতি উহা আদায় করিবেই—সেই জীবন্ত নর-নারীকে আমরা ঠেকাইয়া রাখিব কি করিয়া ? দ্বিতীয় কারণ, সত্যই আমরা যতই পুরাতন সমাজের প্রতি মমতা পোষণ করি না কেন, আমরাই বেশি করিয়া জানি উহা কত পচ্-ধরা, কত ঘুণধরা, কত

মিথ্যা। আধুনিক কালকে আমরাও কার্যত বা চিন্তায় একেবারে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহি নাই। আমরাও বুঝিতেছিলাম —তাহা অচলায়তন; আমরাও চাহিতেছিলাম 'মানুষের অধিকার', মানুষের মানুষ হিসাবে মর্যাদা লাভ। অর্থাৎ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজও আসলে পুরাতন সমাজের অসামঞ্জস্য বুঝিয়াছিল—যতই সে বলিতে চাহুক যে, 'সে-পুরাতন সমাজেও মানুষের বিকাশের অবকাশ ছিল।' সেই কথাটি বলা হইলেই তাহার আপত্তি চুকিয়া গেল। তাহার পরেই সেই দাবী করে—'কিন্তু এই প্রাচীন সমাজের অসামঞ্জস্যে আমার যে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বলিবে না? ইহাই তো মূল সত্য।' শরৎচন্দ্র তাহা বলিতে অগ্রসর হইলে সাধারণ পাঠক যেন আরও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পুরাতন সমাজের যেরূপ নীতি আর বিন্যাস তাহাতে মানুষ টিকিবে কি করিয়া? তাহার ছাঁচে-ঢালা সমাজে ছাঁচের মতই গড়িয়া উঠিতে হইবে। বিজলী কোথাকার নর্তকী, সে আবার বদলাইবে কি করিয়া? চন্দ্রমুখী পতিতা, সে পতিতাই থাকিবে। পিয়ারী সে আবার রাজলক্ষ্মী হইবে কোন্ অধিকারে? সাবিত্রী মেসের ঝি, সে-ও আবার ভালোবাসিবার দাবী করে নাকি? অভয়ার স্বামী বেদমন্ত্রের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিল বলিয়াই কি অভয়ার পক্ষেও সেই পবিত্র বিবাহ-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে? পুরুষকে অবশ্য এই সমাজ কার্যত খানিকটা স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু তবু তাহার

সনাতনী আদর্শে দেবদাস, শ্রীকান্ত, সতীশ, দিবাকর—ইহারা কে উৎরাইতে পারে ?

কথা এই—সেই প্রাচীন জীবনযাত্রা ও জীবনাদর্শের উপর শরৎচন্দ্রের মত এমন অমোঘ আঘাত 'সংস্কার-পন্থীরা'ও করিতে পারেন নাই, অথচ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ তাহাদের সহ্য করিতে চাহে নাই। তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের এই বিদ্রোহকে সেই সমাজ স্বাগত করিল কি করিয়া ? ইহার দুইটি কারণ পূর্বে বলিয়াছি—এক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ; দুই, মূলত নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও এই বিদ্রোহেচ্ছা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন বোধ, ব্যক্তির মর্যাদা-বোধ। কিন্তু আরও কারণ ছিল—তাহারও ইঙ্গিত পূর্বে করা হইয়াছে—উহা শরৎচন্দ্রের সহিত এই নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বা সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধের কথা ; আর উহাই শরৎচন্দ্রের নিজের দৃষ্টিক্ষেত্রের কথা, তাঁহার দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের কথা। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিমাত্র আমাদের মনে হইল—আমরা আত্মীয়ের মুখ দেখিলাম, ইনি 'হাই-ব্রো' বা 'সংস্কারক' জাতীয় সাহিত্যিক নন। যাঁহারা পাদ্রিদের কথায় আমাদের সমাজকে নিজের বলিতে লজ্জা পান, ইনি তাঁহাদের কেহ নন। এই সমাজেরই তিনি একজন, তিনি তাহা প্রাণ দিয়া স্বীকার করেন, প্রাণ মিশাইয়া আমাদের ভালোবাসেন ; আর আমাদের প্রাণও তাই জয় করিয়া লন। মানুষের হৃদয় জয় করিবার এই অস্ত্র লইয়া শরৎচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, আর তাই তাঁহার এই সমাজকে ভাঙিবার

অধিকার,—আপন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার—অস্বীকার করিবে কে? বরং অস্বীকার যাহারা করিতে চাহিল, আমরা—সাধারণ পাঠকেরা—তাহদেরই অস্বীকার করিয়া ফেলিলাম। এই সব পতিতা স্ত্রীলোক আর চরিত্রহীন পুরুষ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎবাবুর বাড়াবাড়ি যে সুনীতির পরিচায়ক নয়, সুরুচিরও পরিচায়ক নয়—ইহা বলিবার লোকের অভাব হয় নাই। এ বিষয়ে 'রক্ষণশীল' কর্তৃপক্ষ, আর 'সংস্কার-পন্থী' কর্তৃপক্ষ দুইই ছিলেন একমত—সকল দলের কর্তৃপক্ষের চক্ষেই বিদ্রোহ একটা অশুভ, তাই অশোভন ব্যাপার। কিন্তু আমরা তাহাদের কথায় কান দিলাম না। শরৎচন্দ্র বলিতে-ছিলেন—এই পতিতা আর চরিত্রহীন, ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে অস্পৃশ্য হইবে কেন? ইহাদের সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ ইহারা সমাজের মানুষ, জীবনপ্রবাহে সঞ্চরণশীল 'চরিত্র', জীবন-সংগ্রামে আহত, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ, ক্রুশবদ্ধ মানুষ, আর সবার উপরে 'মানুষ'—সত্য-মিথ্যা, ভুল-ভ্রান্তি, বেদনা-আনন্দ ভরা মানুষ। 'মানুষ'—হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়া শরৎচন্দ্র যেন এই কথাটাই স্বীকার করিতে চাহিলেন—'ইহারা মানুষ'। বলিতে চাহিলেন সেই অতি পুরাতন কথা—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এইটিই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিক্ষেত্র—এবং তাঁহার এই প্রেমময় দৃষ্টিকেই বলিতে পারি তাঁহার দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। 'মানুষের অধিকার' তিনিও ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাহা পুঁথি পড়িয়া নয়, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়াও নয়। 'ব্যক্তি-সত্তার' স্বপক্ষে তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন; কারণ তিনি হৃদয় দিয়া মানুষকে চিনিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে মহিমা, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে বেদনা। শরৎচন্দ্র যে পুঁথি পড়িয়াও ইহা না জানিতে পারিতেন তাহা নয়,—'নারীর মূল্যের' কথা মনে রাখিলেই বুঝিব সেদিক দিয়াও তাঁহার বিচার-সামর্থ্য ছিল। কিন্তু তিনি আপনার স্বাভাবিক প্রেমের বলে মানবতা-বোধের বিকাশেই মানুষের এই রূপ উপলব্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন,—এই কথা বলাই বোধ হয় আরও ঠিক হইবে।

ভাদ্র, ১৩৫১ বাং

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ

মানবতা-বোধ বা humanism এই যুগের সাহিত্যের একটা বড় সত্য। বর্তমান কালের সাহিত্য এক হিসেবে তাই মানুষের 'মানবীয়তা'র ঘোষণাপত্র হইয়া উঠিয়াছে। এ কালের সাহিত্য যেন বলিতে চাহে 'Ecce Homo.' সে ঈশ্বর-পুত্র নয়, মানব-পুত্রই; আর make his way straight. কারণ, যুগে যুগে সে চলিয়াছে—চলিয়াছে, কেবলই চলিয়াছে। এক-একটা বাধা ভাঙিয়া পড়িতেছে আর তাহার মানবীয়তা,—তাহার স্বরূপ,—আরও উজ্জ্বল, আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথা এই—এই সত্যটাও আবার নূতন রূপে এই যুগেই আবিষ্কার করিয়াছে—আর আবিষ্কার করিয়াছে অত্যন্ত বাস্তব কারণে, সভ্যতার বাস্তব বিকাশে। সামন্ততন্ত্রের ছাঁচকে ভাঙিয়া ফেলিয়া যে ধনিকতন্ত্র বলিল, 'তুমি শুধু দাস নও, প্রভু নও, স্ত্রী নও, স্বামী নও, তুমি মানুষ—মানুষই';—ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিল,—তাহাতেই মানুষ নূতন করিয়া বুঝিল 'man's man for a' that.' অবশ্য সেই ধনিকতন্ত্রই এই সত্যকে আজ চাপা দিতেও চেষ্টা করিতেছে। সে 'প্রমাণ-সই' মানুষ চায়, regimented robot চায়, মানুষ সহ্য করিতে চায় না। কিন্তু কথা এই যে, মানুষের এই মানবীয়তাকে এই ধনিকতন্ত্রই নূতন

করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। ধনিক সভ্যতা তাহা আর নাকচ করিতেও পারিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বুঝিয়া লইতে পারি যে, এই 'মানবীয়তা-বাদ' বা 'মানবতা-বোধ' কি অর্থে 'নূতন'। মানুষ বলিয়া মানুষ যখন নিজেকে চিনিয়াছে, তখন হইতেই এক অর্থে মানবতা-বোধ তাহার মধ্যে জন্মিয়াছে। কিন্তু সে বোধ অত্যন্ত অস্ফুট—সেখানে মানুষ তো প্রকৃতির হাতের অসহায় খেলার পুতুল। তাই সেদিনকার মানবতা-বোধ অর্থ মানুষের মর্যাদা-বোধ নয়, বরং মানুষের অসহায়তা-বোধ, অর্থাৎ দেবতার মহিমা-বোধ,—সে দেবতা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীও হইতে পারেন, আবার গ্রীক্-স্বর্গের জিউস্ বা নিয়তিও হইতে পারেন। সভ্যতার সেই প্রথম স্তরে মানবতা-বোধ ইহার বেশি যায় নাই।

ভারতবর্ষে আমরা মানুষের এই মর্যাদাকে চরম অভিনন্দন জানাইলাম এই বলিয়া—'তত্ত্বমসি'। উহার আসল মর্মটা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তুমি ব্রহ্ম হইতে পার, কিন্তু হাসি-কান্নাভরা মানুষ হিসাবে মিথ্যা। মানুষের এই মর্যাদা আসলে মানুষকে চূড়ান্তভাবে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল। গ্রীক্‌রা মানুষকে এইভাবে মর্যাদা না দিয়া বাস্তব জীব হিসাবেই মর্যাদা দিল। সমস্ত গ্রীক্ সাহিত্য আজও তাই মনে হয় এত আশ্চর্য রকমের 'আধুনিক'। সেখানে মানুষের মানবীয়তা স্বীকৃত হইল—অবশ্য সে মানুষকেও নিয়তিই ভাঙে-

গড়ে। আর, এক হিসাবে তাই সে মানুষকেই মনে হয় এত মহৎ ও এত ট্রাজিক। কিন্তু কথাটি এই, গ্রীক্‌দের চোখে মানুষ বলিতে শুধু গ্রীক্‌ই মানুষ বর্বরজাতির মানুষেরা মানুষ নয়, আর গ্রীক্‌দের হেল্‌টরাও নয়, দাসরাও নয়। প্রাচীন সমাজে এইরূপই হইবার কথা—সেখানে স্ব-শ্রেণীর মানুষেরাই মানুষ, অন্যেরা শূদ্র বা পশুস্তরের জীব,—মানবতা-বোধ তখন পর্যন্ত এইরূপ সীমাবদ্ধ ছিল। তবু ইউরোপের রিনাইসেন্সের যুগে এই গ্রীক্‌ মানবতাবোধও মানুষকে মাতাল করিয়া দিল। 'মানুষ কি আশ্চর্য জীব!'—মিরাণ্ডার মত সমস্ত রিনাইসেন্সের সভ্যতা যেন তাহাই আবিষ্কার করিল। ইহার পরে মানুষকে শুধু আর ভূমিদাস, শুধু পাইক, এমন কি, শুধু গৃহিণী বলিয়াও ভাবিলে চলিবে না। তাহাই ঘোষণা করিল ধনিকতন্ত্রের উদ্বোধকরা "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করিয়া। তাহারই সত্য বার্ন্‌স্‌ উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"Man's man for a' that." নূতন মানবতা-বোধ পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই বার্তা আমাদের পুরাতন সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কানে পৌঁছিল। এই পৃথিবীর মানুষকেই আমরাও নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। আবিষ্কার করিলাম—প্রধানতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনযাত্রার রূপ দেখিয়া (গ্রীক্‌ সাহিত্য পড়িয়া রিনাইসেন্সের মানুষও নূতন করিয়া মানুষকে আবিষ্কার

করিয়াছিল)। কিন্তু আবিষ্কার নিশ্চয়ই করিতাম—কারণ, নূতন সভ্যতার উহাই নূতন বাণী।

ঠিক এই কারণেই ইহাকে 'তত্ত্বমসী' বা চণ্ডীদাসের 'সহজ-মানুষের' সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা ঠিক নয়। চণ্ডীদাসের বাণী আজ মনে হয় মানবতার পরম বাণীরূপ। কিন্তু তাহা মনে হয় আমাদের চক্ষে,—যাহাদের চক্ষে মানব-ধর্ম পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙালীদের চক্ষে। ইহার পূর্বে চণ্ডীদাসের সেই আশ্চর্য বাণীটি লইয়া কয়জন বাঙালী আশ্চর্য হইয়াছেন? চণ্ডীদাসও মানুষকে আধুনিক মানবতা-বোধের দৃষ্টিতে মানুষ বলিয়া চিনেন নাই—তিনি তাহাকে দেখিতেছিলেন সহজিয়া সাধনার দিক হইতে এক সত্য হিসাবে। সেই তন্ত্রে মানুষ একদিকে যেমন সত্য তেমন আবার মিথ্যাও। একদিকে সে সত্য, কারণ তাহার জীবন-লীলা এক পরম সত্যের স্বাক্ষর। আবার অন্য দিকে সে মিথ্যা—কারণ তাহা স্বাক্ষর, চরম সত্য আরও কিছু। 'সহজ মানুষ'—মোটেই সাধারণ মানুষ নয়। আধুনিক মানবতা-বোধের সঙ্গে উহার তফাৎ এই যে, আধুনিক মানবতা-বোধ সামাজিক মানুষকেই মানুষ বলিয়া মানে, সমাজের ভাঙা-গড়ার উর্ধ্বে কোনো 'সহজ মানুষ' কল্পনা করে না, সমাজের ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তাহার ক্রমপ্রকাশিত সত্তাকে দেখে, তাহার ক্রম-উদ্ঘাটিত সম্ভাব্যতার সন্ধান পায়। আধুনিক মানবতা-বোধের

মূল কথাটা এই 'secular man', মর্তের মানুষ—যে শুধু 'অধ্যাত্মিক সত্তা' নয়, একটা 'সামাজিক জীব', এক 'সৃষ্টি'—'আত্মাও' নয়, 'দেবতাও' নয়,—মানুষ। মানুষের এই ঠিক রূপ তো সভ্যতার অন্য স্তরে দেখা সম্ভব ছিল না, সম্ভব হইয়াছে এই স্তরেই—সমাজের আর্থিক বিকাশের একটা উন্নত পৈঁঠায়।

আমাদের সমাজেও যখন আমরা আধুনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কে আসিলাম আমরা নিশ্চয়ই এই মানবতা-বোধ লাভ করিতাম। এই মানবীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভব করিলাম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া। মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে আমরা নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের আমরা তো সেই 'মানুষের অধিকার' রাষ্ট্রে, সমাজে, আর্থিকক্ষেত্রে, আরও কম পাইতেছিলাম। তাই, এই মানবতা-বোধ ছিল আমাদের পক্ষে আরও তীক্ষ্ণ, আরও তীব্র,—সমস্ত প্রাণমনের একটি বেদনাময় অঙ্গীকার। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও আমরা ঠিক তাহাই দেখিলাম—সেই হৃদয় দিয়া হৃদয় চেনা। মানবতা-বোধ শুধু তাহার দৃষ্টিক্ষেত্র নয়; তাঁহার দৃষ্টিও সেই সংপ্রেম দৃষ্টি—তাঁহার পথ প্রেমের পথ, ভালোবাসার পথ।

তিনি যেন আমাদের পাঠক সাধারণের সহিত একাত্ম হইয়াই আছেন।

সত্যই শরৎচন্দ্র যে আমাদের সহিত একাত্ম ছিলেন, তাহা আরও একটু পরেই বুঝিতে পারি। আমাদের সহিত পা মিলাইয়া তিনি স্বদেশীর পথে চলিতে গেলেন, 'শিক্ষার বিরোধ' ঘোষণা করিতে গিয়া কবিগুরুর সঙ্গে বিরোধে অগ্রসর হইলেন, আবার আমাদের পরাজয়ে ব্যথিত ও আহত হইলেন, লিখিতে বসিলেন আমাদের অন্ধ দেশপ্রীতি ও ব্রিটিশ বিদ্বেষের স্তোত্র—'পথের দাবী'। উহা আমাদের সেদিনকার রাজনৈতিক নৈরাশ্য ও দৃষ্টিহীনতার একটি অগ্নিময় পরিচয়—নিম্ন মধ্যবিত্তের বেদনা ও বিষ তাহাতে আছে, কিন্তু তাহাতে নাই কোনো পথের নির্দেশ। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তেরা তাহা জানিতাম না, আমাদের আপনার মানুষ শরৎচন্দ্রই বা তাহা জানিবেন কিরূপে? আমরা রাজনৈতিক পরাজয়ে ভাবিতেছিলাম—জন-জাগরণের কথা। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা বা সঙ্কল্প আমাদের ছিল না। সব্যসাচীর বা তলোয়ার-কারের জন-বিদ্রোহের বক্তৃতা এজন্যই এমন উদ্দেশহীন, ও অবলম্বনহীন। বুদ্ধিকে হৃদয়বৃত্তির নিকট খাটো করিলে এই বিপদই ঘটে। জীবনে বুদ্ধির স্থান প্রথমে, যদিও হৃদয়-বৃত্তির স্থান চরমে। কিন্তু সাধারণত আমরা ইহার ওলট-পালট করি,—চিন্তায় ও কর্মেও তাই গলদ থাকিয়া যায়। তখনো আমরা বুঝি নাই—শরৎচন্দ্রও দেখেন নাই—জনশক্তিই এ কালে সৃষ্টির অধিকারী, আর তাই জনতাই বিপ্লবী শক্তি।

শরৎচন্দ্র আমাদের এত আপনার ছিলেন বলিয়াই আমাদেরকে ছাড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। এমন কি, যে 'বিদ্রোহের' কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি সেখানেও তিনি আমাদের সহযাত্রীই ছিলেন—অগ্রদূত হইতে যান নাই। যে পরিমাণে আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ—সাধারণ পাঠক—অগ্রবর্তী হইতে পারিয়াছি তিনিও সেই পরিমাণেই আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আমাদের এই যাত্রার প্রত্যেকটি মোড় যেন তাঁহার সৃষ্টিতে সুচিহ্নিত হইয়া আছে। তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া চলিলেন, তবু আমাদেরই ভরসা দিতে আবার নানা ছলনারও আশ্রয় লইলেন—তাহা না হইলে তখন আমরা তাঁহার সঙ্গে চলিতেই স্বীকৃত হইতাম না। 'সাবিত্রীকে' আত্মত্যাগ করাইতেই হইবে। 'কিরণময়ীকে' উন্মাদিনী করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না করিলে কি লেখকের গত্যন্তর ছিল? এইরূপেই পার্বতী বৃদ্ধ ভুবনমোহনের মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, মৃণাল বৃদ্ধ স্বামীটির সেবায় অন্তত বাহ্যত বিশুদ্ধ থাকে। শেষে কমলকে পর্যন্ত শুদ্ধাচারিণী করিয়া তিনি থামিলেন—আর সতীশ হইতে জীবানন্দ পর্যন্ত বহু পুরুষকেই 'শুদ্ধি' না করিয়া তিনি ছাড়িয়া দিলেন না। তাহা না হইলে আমরাই কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম?

এই আমাদেরই মানসিক দৈন্য ও অস্পষ্টতা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও প্রত্যেক স্তরে মিলিবে। যেমনি যতটুকু আমরা

অগ্রসর হইয়াছি তেমনি ততটুকু তিনি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। 'গৃহদাহে'র অচলাই বোধ হয় আমাদের তখনকার চিন্তার সীমান্ত নির্দেশ করে। ইহার পরে 'শেষ প্রশ্নের' আমরা প্রশ্নের উত্তর জানি না; শরৎচন্দ্রও উত্তর দেন না। অথচ, মানুষকে তিনি এতটুকু ভালোবাসেন, ভালোবাসার রহস্য তিনি এতখানি বোঝেন যে, মানুষের এই ভালোবাসাকে তিনি অস্বীকারও করিতে চাহেন না। কিন্তু তাহা প্রশ্নই থাকিয়া যায়—মানুষের ইতিহাসে যে নূতন উত্তর ফুটিয়া উঠিতেছিল বাঙলার আমরা পাঠক সাধারণ তাহা পড়িতে পারি নাই। কারণ আমাদের সমাজে চারিদিকে তখন অন্ধকার নামিতেছে, আমরা আর পথ খুঁজিয়া পাই নাই। সেই প্রায়ান্ধকারের দিনে আমরা আগে চলিব না পিছনে চলিব তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তেমনি দিনের আমাদের মানসিক অস্পষ্টতা ও পশ্চাদ্‌গামিতার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্বে, আর বিপ্রদাসে। আর একবার যেন শরৎবাবু বলিতে চাহিলেন —'সনাতনের স্বপক্ষে এখনো বলিবার কিছু আছে।' অবশ্য শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের অস্পষ্টতা ও বিপ্রদাসের গতি-বিমুখিতার কথা ভাবিলে আর দুইটি কথাও মনে করিতে হইবে—শরৎচন্দ্র তখন জীবনের শেষ যামে আসিয়া ঠেকিতেছেন, তাঁহার শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, এই নিস্তেজ শক্তি লইয়া তিনি যে জীবন-চিত্র আঁকিতে বসিলেন তাহা তাঁহার

পূর্বাপর পরিচিত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-চিত্র নয়—এই জীবন ও এই চরিত্র পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ স্ববশ করেন নাই, তখন আর তাঁহার করিবার মত সময় নাই। বাঙলার নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজও তৎক্ষণে আর্থিক-সামাজিক বিপর্যয়ে অগ্রে এবং পশ্চাতে ছুটাছুটি সার করিয়া তুলিয়াছে, কলোনির জীবনে আর পথ দেখিতেছে না।

বলা বোধ হয় দরকার নাই যে, যে-"পাঠক সাধারণ," "Common Reader", শরৎচন্দ্রের আপনার, তাহাদিগকে বাঙলার জনসাধারণ, "Common Man", বলা ঠিক হইবে না। বাঙলার জনসাধারণ নিরক্ষর, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজই পাঠক সাধারণ। তাহাদের সঙ্গে জন-সাধারণের ধন-বৈষম্যের তফাৎ তখনো প্রকাণ্ড ছিল না,—এখন তাহা আরও কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা 'ভদ্রলোক', এই হিসাবে জনসাধারণের সঙ্গে 'পাঠক সাধারণের' জীবনযাত্রার ও দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ ছিল পূর্বে দুস্তর—এখনো তাহা ক্ষুদ্র নয়। অথচ কোনো লেখকই নিরক্ষরদের উদ্দেশ্যে আপনার লেখা লেখেন না—যাহাদের উদ্দেশ্যে লেখেন তাহাদের ভাবনা-ধারণা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে লেখকের লেখার রূপকে নিয়মিত করিবেই। তাই বলিয়া যাহা সত্যই সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা অন্য স্তরের লোকেরা পড়িতে শিখিলে গ্রহণ করিতে পারিবে না—ইহাও কখনো সত্য নয়। সৃষ্টি—শ্রেণীর বাধা স্বত্বেও—তাহার স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইবে। এই

কারণেই এই কথা মনে করা হাস্যকর হইবে যে, শরৎচন্দ্র নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনকে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন। কিংবা, এই নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ তো আজ ভাঙিয়া চলিয়াছে—উচ্চ মধ্যবিত্তেরা উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে, 'রেণ্টিয়ার' শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে, নিম্ন মধ্যবিত্তেরা নিম্নতর স্তরে বেতন-দাসে পরিণত হইতেছে,—অতএব, অদূর ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র তাঁহার পাঠক সমাজ হারাইবেন, রাহুগ্রাসে পড়িবেন। প্রথম অবধি যে কথা সত্য সে কথা ভুলিলেই এইরূপ হাস্যকর কথা কেহ বলিতে পারেন। সেই সত্য কথাটা এই—শরৎচন্দ্র স্রষ্টা, তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, মানুষকে আঁকিয়াছেন, তাঁহার পাতায় জীবনের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাঁহার চিত্রে আছে অপ্রমেয় প্রমাণ। এই মানব-স্বীকৃতির জন্য শরৎচন্দ্র সকল শ্রেণীর স্বীকৃত থাকিবেন।'

এই জন্যই শরৎচন্দ্রের ত্রুটি বা গুণের হিসাব লওয়া কতকাংশে নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। আমরা জানি—তিনি নিরাসক্ত চিত্রকর নন; তিনি আমাদের মত আবেগ-প্রবণ, এমন কি, ভাবে-ভাষায় এক-এক সময় তিনি তাল সামলাইয়া উঠিতেও পারিতেন না। জানি, তিনি সুবৃহৎ পটে জীবনের মহাচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই—শ্রীকান্তের মত গ্রন্থেও আছে মানুষের মিছিল, নাই গোরার মত মহাকাব্যের ব্যাপকতা। আরও জানি, তিনি—তাঁহার মত শক্তিধারী স্রষ্টাও—গড়িতে বসিয়া একই

মুখ একাধিক বার গড়িয়া ফেলিতেন, বিচিত্র মানুষকে তিনিও যেন তত অজস্র রূপ দিতে পারেন নাই। ইহাও জানি, কেহ কেহ তাঁহার ভাষার ভুলও ধরিয়া ফেলিয়াছেন; অথচ ইহাই কি শেষ কথা? না, শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইহা একটা উল্লেখযোগ্য কথা? যে বাঙলা কথা-সাহিত্যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, শরৎচন্দ্রও তাহার উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট ভাষারীতি শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান—পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরাও তাহার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্য, নূতনতর রীতিও গড়িয়া উঠিতেছে। আর অত্যন্ত সত্য কথা এই যে, ভাব ও ভাষা পার্বতী-পরমেশ্বর, এবং এক একজনের হাতে আবার তাহারও বিশিষ্ট রূপ ফোটে।

শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শুধু এই কথা বলাই তাই যথেষ্ট। আর এই কথা বলিলেই বলা হইল—শরৎচন্দ্র বাঙালীকে জীবনের পথে নূতন পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন—চির দিনের মত তাহার সহযাত্রী হইয়া আছেন। আর একটু বিশিষ্ট অর্থেও এই কথাটা বলা চলে—শরৎচন্দ্র মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। বন্দী মানুষের এমন বন্ধু—মানুষ বড় বেশি পায় নাই। আমাদের সমাজে আবার সর্বপেক্ষা বড় বন্দী—আমাদের বন্দিনীরা। বাঙালী শিল্পীর হাতে তাঁহাদের চিত্র বরাবরই ভালো ফুটিয়াছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত বাঙলার নারীকে আর কেহ দেখিয়াছেন কি? স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, লীলাময়ী—দীপ্তিময়ী আর ক্ষুব্ধা, অস্থির—সেই বাঙালী নারীকে শরৎচন্দ্র যেমন রূপদান করিয়াছেন তেমন আর কেহই পারেন নাই।

ইহারও কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি। তিনি তো শুধু দ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বন্দীর বন্ধু, ব্যথার ব্যথী। তাঁহার দৃষ্টি-পথ ছিল প্রেমের পথ। যে সব মানুষকে বলা যায় 'suffering humanity'-র দরদী, শরৎচন্দ্র যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান পাইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

এইখানেই একটা প্রশ্ন উঠিবে—ইহা কি বাস্তব শিল্পের লক্ষণ—এমন হৃদয় দিয়া মানুষকে দেখা? সাহিত্যে-বাস্তবতা লইয়া তর্কের শেষ নাই। কোনো শিল্পই একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু সব শিল্পীই সমান বস্তুনিষ্ঠও নহেন;—অনেকেই কল্পনাশ্রয়ে বাস্তবকে পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহেন, অনেকে আবার আবেগ-বশে বাস্তবকে একটা অযথার্থ রূপ বা মূল্য দান করিয়া বসেন। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে বিচার-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। দুই একটি মূল কথা মনে রাখিলেই চলে—সাহিত্যের ও শিল্পের বাস্তব আর বিজ্ঞানের বা ইতিহাসের বাস্তব এক জিনিস নয়। সাহিত্য ও শিল্প জীবন-সত্য ও মানব-সত্যকে প্রকাশ করে। তাই, ঘটনা-যাথার্থ্য তাহার চরম কথা নয়—জোলার বাস্তবতা শিল্পের পক্ষে কৃতিত্বের বড় প্রমাণ নয়।

জীবন-সত্য ও মানব-সত্য তাহাতে রূপ লাভ না করিতেও পারে। শিল্পের বাস্তবতাই জীবন-সত্যকে প্রকাশ করে—মানব-সত্যকে সুস্পষ্ট করে। তেমন রূপকার যদি বলেন, 'আমি জীবনকে ভালোবাসি, আমি মানুষের অমর্যাদা সহ্য করিব না', তাহা হইলে তাহাতে শিল্পের বা সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না—আসল কথা, তিনি জীবনকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাঁহার আবেগ ও দৃষ্টি সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে কি না।

আর একটি কথাও আছেঃ 'নিরাসক্ত' শিল্পী কতটা তাহা জানি না। কিন্তু একটা কথা বুঝি—'বিশুদ্ধ শিল্পীর' অপেক্ষাও আমরা রলাঁকে বেশি আপনার বলিয়া মনে করি। গোর্কি ও শরৎচন্দ্রকে আপনার বলিয়া চিনি। আসলে শিল্পও তো জীবনেরই একটি স্বীকৃতি। যত সুনিপুণ হোক্, শুধু নৈপুণ্যের বলে জীবন-সত্যের শেষ পর্যন্ত তাহা আমাদের পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়—জন্ম, মৃত্যুর মত গভীরতম জীবন-সত্যের মুখোমুখি আসিয়া পড়ে—সেখানে নিপুণ শিল্পে আর কুলায় না, সেখানে প্রেমময় সহযাত্রীর স্পর্শ আর বাহুডোর আমরা কামনা কবি ; আর তাহা পাইলে সেই বাহু জড়াইয়া ধরি, জানি নিজেকে আজ চিনিলাম—জানি জীবন অদ্ভুত ও সত্য।

—আর এইটিই মূল কথা।

বাঙলার উপন্যাসের যুগ

বাঙলা সাহিত্যে কি 'উপন্যাসের যুগ' আসিতেছে ?

বাঙলা উপন্যাসের জন্ম হইয়াছে অনেক দিন। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়কে' (১৮৫২) না ধরিলেও 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) হইতে তাহার প্রারম্ভ হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমের হাতে উপন্যাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও উপন্যাস কম রচনা করেন নাই। তাঁহার সময়েই শরৎচন্দ্রেরও উদয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ইঁহাদের সমতুল্য প্রতিভা অন্য কেহ না থাকুন, বাঙলার আজ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন জন কয়, আর সেই প্রথম শ্রেণীর উপকণ্ঠেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন আরও কয়েকজন বাঙালী কথাকার। একই কালে এতগুলি সৃষ্টিক্ষম ঔপন্যাসিক বাঙলায় পূর্ববর্তী কোনো যুগে ছিলেন কি ? এত সক্ষম ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব নিতান্ত দৈব নহে, আকস্মিকও নহে। ইহার পিছনে যে কারণ আছে —বাঙালী সমাজে যে পরিবর্তন এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঘটিতেছে ও মানুষের যে বিচিত্র পরিচয় বাঙালী লেখকের পক্ষে এই বিংশ

শতকের মধ্যভাগে সত্য হইয়া উঠিতেছে—তাহাতে আরও বেশী করিয়া ভাবা চলে যে, বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আজ উপন্যাস লেখা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এই মানব-সত্য ও বাস্তব জীবনের প্রকৃষ্ট বাহন এ যুগের উপন্যাস।

'উপন্যাসের যুগ' বলিতেই আমাদের অবশ্য মনে পড়ে পাশ্চাত্ত্যদেশের উপন্যাসের যুগ। তাহা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কম বেশী আমরা উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে, তাহারই প্রেরণায়, অনেক সময়ে তাহারই অনুকরণে। ইহার পূর্বে আমরা গল্প শুনিতাম, নানা আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, রচনা করিতাম। গল্পের নেশা আমাদের অপেক্ষা কোনো জাতির বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু "উপন্যাস" যাহাকে বলে তাহা আমরা তখনো সৃষ্টি করি নাই। সেই সমাজে তাহার সৃষ্টি সম্ভবও ছিল না। উপন্যাস জন্মে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের যুগে—উহা ধনিকতন্ত্রেরও যুগ। উপন্যাস তো শুধু গল্পে বলে না, বলে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা—যে শুধু 'বর্গ চরিত্র' নয়। যাহারা বিশিষ্ট মানুষ, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে বিশিষ্ট হইতেছে, বিচিত্র হইতেছে, বিকাশ লাভ করিতেছে, আবার পরিবেশকেও প্রভাবান্বিত করিতেছে—তাহারা, তাহাদের জীবনই উপন্যাসের উপাদান। ছাঁচে-ঢালা মানুষ তাহারা নয়; ছাঁচে ঢালা সমাজ যেখানে সেখানে তাই উপন্যাস জন্মে না। উপন্যাস

জন্মিতে থাকে যখন সমাজের ছাঁচ ভাঙিয়া স্বতন্ত্র মানুষ বাহির হইতে চায়, বাহির হইতে থাকে।

উনিশ শতকের মানব-উপাদান

ইংরেজিপড়া বঙ্কিমকে আমাদের প্রথম ঔপন্যাসিক বলিতে পারি। নিশ্চয়ই ইংরেজি 'নভেলের' আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ; সমাজের একটা ছাঁচ-ভাঙা মানবের সেই প্রকাশ তিনিও দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি যথার্থ উপন্যাস লিখিতে অগ্রসর হন। কারণ তৎপূর্বেই আমাদের সমাজের ছাঁচ-ভাঙা শুরু হইয়াছিল। আর উহার কারণ ইংরেজের রাজ্য জয়, এদেশের উপর ব্রিটিশ ধনিকতান্ত্রিক সমাজের আঘাত। তাহাতেই আমাদের পুরাতন সমাজের ছাঁচ ভাঙিতে থাকে। সেই বাস্তব আঘাতে ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে আমাদের দেশেও ব্যক্তি নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকে। উহার প্রথম প্রকাশ—'হিন্দু ইস্কুলের' ছাত্রগণের পুরাতন আচার-বিচার সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ব্যক্তি তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে লাগিল। আমাদের সমাজেও তাই ব্যক্তির উদ্বোধন বঙ্কিমের আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই সামাজিক পটভূমিকাতে বঙ্কিম তাঁহার ইংরেজি-পড়া মন লইয়া উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু আমাদের পক্ষে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ স্বাভাবিক ভাবে আসিতে পারে নাই। আমাদের বাধা ছিল দুই দিকেই—

এক বাধা বিদেশীয়, আর এক বাধা দেশীয়। দেশীয় বাধা—পুরাতন সমাজশক্তি ও সামন্তসমাজ। বিদেশীয় বাধা—সাম্রাজ্যবাদ! তাহা—আর এক ছাঁচে-ঢালা সমাজে আমাদের পুরিয়া রাখিয়াছে। আমরা তখন স্বাধীনতা পাইলাম,—স্বাধীনতা পাইলাম কেরাণী হইবার; স্বাধীনতা পাইলাম কতকটা ধনিক-তান্ত্রিক জীবন ও সাহিত্য বুঝিবার; কিন্তু স্বাধীনতা পাইলাম না নিজেদের ধনিকতান্ত্রিক সমাজ গড়িবার। আমাদের যে কাঠামোতে পুরিয়া দেওয়া হইল তাহার চারদিকেই সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থের বেড়া উহার অভ্যন্তরে আবার আর এক প্রস্থ বেড়া ইংরেজদের নূতন জমিদার, নূতন তল্পীদার স্বার্থের। ব্যক্তির সত্যকার স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় কতটুকু ছিল? এই কারণেই—এই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের পুরাতন সমাজকে ভাঙিতে লাগিল বলিয়াই—আমাদের চক্ষে সেই অচল সমাজের মূল্য পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল। আমরা শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত প্রত্যেক প্রাচীন জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় একটা সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিলাম।

কিন্তু উপন্যাসের দিক হইতে কথা এই যে, এই যে জটিলতা আমাদের সমাজ ও জীবনে দেখা দিল তাহাতে এই দেশের মানুষ সেই মুহূর্তেই উপন্যাসের এক বিশেষ উপাদান হইয়া উঠিবার কথা। ব্যক্তি জাগিতেছে, আর জাগিতে না জাগিতেই দেখিতেছে দুই দিকে তাহার দুই দুস্তর বাধা—রাষ্ট্রক্ষেত্রে

তাহার পঙ্গুতা আর সমাজক্ষেত্রে আচারে-বিচারে তাহার বন্দীত্ব। আবার, বাস্তবক্ষেত্রের এই বাধা তাহার মানসক্ষেত্রে আরও জটিলতা সৃষ্টি করিল—সে ধনিকতন্ত্রকেও স্বাগত করিতে পারিল না, আবার তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেও অস্বীকার করিতে পারিল না ; সে পুরাতন অচল সমাজকেও আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না, অথচ উহার ধ্বংসেও সায় দিতে চাহে না। এই বাস্তব ও মানসক্ষেত্রের ঘটনা ও আবেগের সংঘাতে এইরূপ সমাজের মানুষ স্বভাবতই উপন্যাসের উপযুক্ত "চরিত্র" রূপে লেখক ও স্রষ্টাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কথা।

তাহাই করিয়াছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইঁহারা এই বাঙালী জীবনকে উপন্যাসের উপযুক্ত উপাদান রূপে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী লেখকেরা তখনো ভাবিতেছিলেন—এ বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্য নাই, ঘটনা নাই। তাহার কারণ তাঁহারা এই জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহেন নাই, জীবনকে দেখিতেছিলেন পরোক্ষে—বিলাতী নভেলের আলোকে ও পুঁথিপড়া দৃষ্টিতে। তাই দুই একজন মাত্র প্রতিভাশালী স্রষ্টা তখন সার্থক ঔপন্যাসিক হইয়া উঠিয়াছেন। অন্যেরা উপন্যাসের সত্য বুঝিতে পারেন নাই, গ্রহণও করিতে পারেন নাই—তাঁহারা বিলাতী নভেল হইতে প্লট খুঁজিতেছিলেন। পরবর্তী কালে বিলাতী উপন্যাসের অনুসরণে কেহ কেহ লিখিতে-

ছিলেন চতুর কথাবার্তা, মতামত, মনস্তত্ত্ব। অথচ তাঁহাদের সম্মুখেই উপন্যাসের উপাদানের অভাব ছিলনা।

নূতন শক্তি-সংঘাত

আমাদের সমাজে সেই উপাদান আজও তেমনি আছে। মূল সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় নাই। সামন্ততন্ত্র মরিয়াও মরে নাই, ধনিকতন্ত্র জন্মিয়াও জন্মে নাই। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াও ফুটিতে পায় না; আর স্তর-বিভাগ বাড়িয়াও সুচিহ্নিত হয় না। কিন্তু ইহার উপরে আরও নূতন সামাজিক শক্তির আঘাত আসিয়া পড়িতেছে, বিশ্ব-সংকটের ঘাত-প্রতিঘাত এই সমাজেও আমরা এখন দেখিতেছি।

তাহাতেই একদিকে আমাদের অর্ধস্ফুট ব্যক্তি-চেতনা আরও তীব্র ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে সাহিত্যিক ও লেখক সমাজ উহার নিষ্ঠুরতম আঘাতে হইয়া উঠিতেছেন বাস্তবমুখী,—এমন কি, সমাজ সচেতেন। —এই যুগের বাঙালী আমরা নানা বিরোধী ঘটনা ও ভাবের তরঙ্গে কত আকর্ষণীয় উপাদান হইয়া উঠিয়াছি। কত জটিল ও বিচিত্র আমরা—কত বিশিষ্ট আমরা প্রত্যেকে, আর কত অপরিস্ফুট রহিতেছে আমাদের বৈশিষ্ট্য। তথাপি,—আমাদের ব্যক্তিত্ব সুসংহত হইতে না হইতে কত ব্যাহত, আর কত ভগ্ন; কত হাস্যকর আমরা, আর কত শোকাবহও!

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের একটা হিসাব লইলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারি। গোড়ার কারণ বারবার বলিয়া লাভ নাই—তবু একবার স্মরণ করিব। আমাদের জীবন ছিল সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এক ঔপনিবেশিক জীবন—আধা-সামন্ততন্ত্র, আধা-ধনিকতন্ত্রের সমাজে আমরা মানুষ। এই সমাজে একদিকে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর হইতে কোচবিহার রাজকোটেও আছে, আর আছে জমিদার-তালুকদার, জায়গীরদাররা, আছি সাম্রাজ্যবাদের তল্পীদার মধ্যবিত্ত আমরা, আছে অসংখ্য কৃষক ও ক্ষুদ্র করিগর; আবার ইহারই মধ্যে আসিয়া গিয়াছে নবজাত দেশী ও বিদেশী ধনিক, টাটা-বাটা-বিড়লা, আর তাহাদের এবং রেলওয়ে ও ডকের শ্রমিক দল। অসামঞ্জস্যের অভাব নাই, তাই সবই অপরিস্ফুট; কিন্তু বৈচিত্র্যও কম নাই।

অষ্টাবক্র-রূপ

জীবনক্ষেত্রে ও মানসক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্যের ফল ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই একই কালে আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ আবার টোটেম-টেবুর যুগেরও মানুষ। যে প্রাচীন জাতি ধারাবাহিকতা বজায় রাখে তাহাদের এই অবস্থা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাহারা সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনে বন্দী না হয় তাহারা সমাজ-বিকাশের সহজ নিয়মেই সমাজ-বিপ্লব সংসাধিত করে,

পুরাতনকে আক্ষরিক মূল্য দেয় না, তাহার ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করে; নূতনকে আয়ত্ত করে, পুরাতনকে বিকাশের সহায়ক করিয়া লয়। কিন্তু আমরা 'ঔপনিবেশিক' শাসনের চাপে সেরূপ স্বাভাবিক ভাবে কিছুই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। আচারে-বিচারে হিন্দু-মুসলমান সবাই আমরা তিন হাজার বৎসরের বোঝা কাঁধে বহিয়া ফিরি—আবার এ যুগের যন্ত্রচালিত সভ্যতাকে স্বীকার না করিয়া পারি না। বিজ্ঞান পড়ি, রেডিও শুনি, সিনেমা দেখি, রেল, ট্রাম, ষ্টিমার, তার, বেতার, সংবাদপত্র কিছুই বাদ দিই না। ইহারই মধ্যে আবার করকোষ্ঠী বিচার করি, গণ মিলাইয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিই, ধনতান্ত্রিক নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া sacramental বিবাহকে সহজেই পণ্য করিয়া লই। অথচ মেয়েদেরও পড়াই, নিজেরাও এক আধটুকু প্রেমের চর্চা না করি তাহা নয়, কিন্তু বিবাহকালে আবার পিতৃভক্ত রামচন্দ্রও হই। মৃতাশৌচেরও দিন প্রায় প্রত্যেকেই কামাইতে চাই;—সকলেই ব্রাহ্মণ হই, ক্ষত্রিয় হই, পাইলে কেহই বিলাতী খানা খাইতেও দ্বিধা করি না—এই অপূর্ব জগা-খিচুড়ীর তালিকা দেওয়া অসম্ভব। কারণ, ইহাই আমাদের জীবন। আর, ইহাতে হাস্যকরতা যেমন আছে তেমন শোচনীয়তাও আছে, আছে মানুষের নানা ছোট বড় জিনিসের টানে মরিবার—ও বাড়িবার—অবকাশ।

স্বাধীনতার অস্থির চেতনা

প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষের মূল প্রশ্নটা স্বাধীনতার প্রশ্ন—ব্যক্তি স্বাধীনতার তথা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই শতাব্দীতে অন্য কোনো নাম দিয়া আমাদের সামাজিক চেতনাকে বুঝানো যায় না। কিন্তু মুশকিল এই—এই জাতীয়তাবোধ আবার আমাদের মনে ও কাজে কোনো একটা সুস্থির রূপ গ্রহণ করে নাই। আমরা বাঙালীরাও একই কালে ভারতীয় জাতীয়তা ও বাঙালী জাতীয়তা দুই ধারণাতেই বর্ধিত হইয়াছি। স্বাধীনতাবোধ তীব্র হইয়া উঠিতেই আজ ভাবিতে হইতেছে—কতটা ভারতীয় সচেতনতা কতটা বাঙালীর জাতীয়তার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারি। বাঙালীর আর্থিক জীবন সাম্রাজ্যবাদীর হাতে ছিল, আজ ভাটিয়া-মারোয়াড়ী-বোম্বাই-ওয়ালা তাহাতে অংশীদার হইতেছে; তাহারই ফলে বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনেরও তাহারা কর্ণধার হইতেছে। যাহারা বাঙলা ভাষাও জানে না, বলে না, তাহারাই হইতেছে বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা—এই সব কথা হিন্দুমুসলমান, 'পাকিস্তান-ওয়ালা' 'হিন্দুস্থান-ওয়ালা', কোন্ বাঙালীর মনে আঘাত না দেয়? মানসিকক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালী এই সংঘাতে কম বেশি চঞ্চল হইবেই।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা কম নাড়া দেয় না—হিন্দু মুসলমানের

সম্প্রদায়গত আনুগত্য ও বিরোধ। তাহার পিছনেও অনেক ঐতিহ্য, অনেক আবেগ সঞ্চিত হইয়াছে, অনেক স্বার্থও দানা বাঁধিতেছে। "ভারতীয় জাতীয়তা বনাম বাঙালী জাতীয়তা" আধুনিক সামাজিক বিকাশের একটা অপরিহার্য স্তর। কিন্তু "হিন্দু-জাতীয়তা বনাম মুসলিম জাতীয়তা"-র সেইরূপ আধুনিক সামাজিক ভিত্তি নাই। তাহার ভিত্তি মধ্যযুগীয় জীবন-পন্থা ও চিন্তার; কিন্তু তাহার জট আরও শক্ত। হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রায় হাজার খুঁটিনাটিতে তফাৎ আছে, তাহা লইয়াই হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমান। তাহা সত্বেও তাহারা বাঙালী —ভারতবাসীও। কিন্তু তাহার জন্যই সেই আধুনিক জাতি-চেতনা পুরাতন সম্প্রদায়গত চেতনার দ্বারা আবার ব্যাহত হইতেছে।

অর্থাৎ, একই কালে আমাদের জীবন এই দুই পৃথক পৃথক আবেগ-আকাঙ্ক্ষায় বিভক্ত ও খণ্ডিত হয়। সামাজিক বিন্যাসের দিক হইতে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহাতে পাশাপাশি দুইরূপে শ্রেণীবিভাগ হইতেছে, সামন্তযুগের ও ধনিকযুগের। দুই শোষণধর্মী একই সঙ্গে শোষণ চালাইতেছেন; এই সমান্তরাল বিভাগ আবার গুলাইয়া দিতেছে সম্প্রদায়গত খাড়া বিভাগ। ফলে সংকট আরও জটিল হয়—আমাদের মানসিক ও বাস্তব জীবন এই দুইরূপ দ্বন্দ্বে সংগ্রামসঙ্কুল হয়।

ইহারই সঙ্গে জড়িত হইলেও আবার ইহা হইতে পৃথক আমাদের আর এক সংকট—বাঙলার সংস্কৃতি-বিভ্রাট। উহাকে এক দিক হইতে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান-সাংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে, আবার বাঙলার পৌর ও পল্লী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও বলিতে পারি। কিন্তু তাহা আংশিক দেখা হইবে। এবং উহাকে বলিতে পারি জন-সংস্কৃতির ও বাঙলার ভদ্র-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক রূপ। এই ব্যবস্থায় বাঙলায় একটা মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয়। তাহারা ধনিকতান্ত্রিক সংস্কৃতির মানস-সন্তান; তাই তাহাদের সৃষ্টি প্রয়াসে ধনিকতন্ত্রের চিন্তা, কল্পনা, আদর্শ প্রভৃতি সরাসরি গৃহীত হয়। যতদিন ধনিকতন্ত্রের সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ ছিল ততদিন উহার এই পুঁথিগত ও ভাবগত প্রেরণা এই ভদ্রশ্রেণীর সৃষ্টিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আবার ধনিকতন্ত্রের বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকতন্ত্রের সৃষ্টিতে বিকার যেমন দেখা দেয়, এদেশের ভদ্রশ্রেণীর ধার-করা প্রেরণায়ও তেমনি আবিলতা আসিতে থাকে—অর্থাৎ ভদ্র-কাল্‌চার তাহার স্বাচ্ছন্দ্য হারায়। কোনো কালেই তাহার উৎস ঠিক এ-দেশের জীবনক্ষেত্রে সে পায় নাই, তাই তাহার সেই ব্যর্থতার বোঝাই তখন তাহাকে চাপিয়া ধরে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়, কি ভদ্র-কাল্‌চারের, কি মিশ্রা-কাল্‌-চারের (যদি 'লীগের' চেষ্টায় তাহা জন্মে) ইহাই হয় পরিণতি।

অন্য দিকে জনসমাজে যে স্বচ্ছন্দ সংস্কৃতিধারা বহিয়া

আসিতেছিল—বাঙলায় প্রধানত তাহা ছিল পল্লী-সংস্কৃতি—বণিক-সভ্যতার আঘাতে তাহারও দিন ক্রমে ফুরায়। পুরাতন সমাজ ও পল্লীজীবন নাই,—জীবন শহরে হাটে-বাজারে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। পল্লীর ভাসান, পাঁচালী, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, জারিগান, সারিগানও তাই স্বাভাবিকভাবে আর বিকশিত হয় নাই। এমন কি, শুধুমাত্র ঐ সব রূপে ও কথায় আজ পল্লীর কৃষকও তৃপ্তি পায় না। তাহারা থিয়েটার দেখে, সিনেমায় ভিড় করিয়া আসে, উহার গানে গল্পে আনন্দ পায়। তাই অবস্থাটা এই :—বাঙলার ঔপনিবেশিক কাল্চার তো পল্লী-সংস্কৃতি ও ভদ্র-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও শিষ্ট-সংস্কৃতি, এই দুই রূপে দ্বিধাবিভক্তই, অধিকন্তু ঐ দুই ধারাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় স্রোতোহীন। আর বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই সংকট—বা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির এই অচলতা—কোন্ বাঙালীকে চঞ্চল করে না ?

মোটের উপর এই ছিল আধুনিক বাঙালী জীবনের আসল রূপ—'ঔপনিবেশিক' সংকটে চাপা-পড়া জীবনযাত্রা, সে সমাজে শ্রেণীবিভাগ অস্পষ্ট, জাতীয়চেতনাও অস্ফুট। ইহার মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধ-আনুগত্যের টান, আচারে-বিচারে পুরাতনের প্রভাব ও নূতনের স্বীকৃতি, আবার শিক্ষায় দীক্ষায় দুই নিষ্প্রাণ সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও বিভ্রাট ;—এই সকলে মিলিয়া আধুনিক বাঙালী জীবনে আমরা যেমন নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বেশি ব্যাহত

দেখিতেছি, তেমনি সে ব্যক্তিত্বের অসম্ভব বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনার কথাও বেশি বুঝিতেছি। এই কারণে লেখকের চোখে আমাদের জীবন হাস্যকর ঠেকিবার কথা, আবার শোচনীয়ও ঠেকিবার কথা,—কিন্তু জটিল ও আকর্ষণীয় বলিয়া নিশ্চয়ই ঠেকিবে। ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ-কালের বাঙালী সত্যই এই সব কারণে উৎকৃষ্ট উপাদান—শরৎচন্দ্র তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মহাযুদ্ধ ও ভাব-সঙ্কট

কিন্তু সেই বিচিত্র বিভ্রান্ত জীবন আরও বিচিত্র আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে বর্তমান সময়কার ঘটনাবলীর দুর্বার আঘাতে। প্রধানত যুদ্ধ হইতেই উহার উৎপত্তি ধরা যায়—যদিও যুদ্ধের উৎস আবার সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সংকটে, আর সেই ধনতন্ত্রেরই 'ঔপনিবেশিক' রূপ আমাদের দেশে আমরা দেখি।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে একটা সরল, বাঁধা-ধরা চেনা-পরিচিত সূত্রে ব্যাখ্যা করিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম; কিন্তু তাহা পারি না। একই কালে এই যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধও বটে, আবার অনেকে দেশেই কতকাংশে গৃহযুদ্ধও বটে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বলিতেছি, কারণ, অনেক জাতির পক্ষে ইহা স্বদেশরক্ষার ধর্মযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ বলিতেছি, কারণ, স্পেনে ফ্রাংকোর দল, ফ্রান্সে 'তুইশ' পরিবার' হইতে নরওয়ের কুইস্‌লিং ও পোল্যাণ্ডের পূর্বতন

রাষ্ট্রকর্তারা কে না চাহিয়াছে হিটলারের হাতে নিজেদের দেশের জনশক্তির পরাজয়? কিন্তু যুদ্ধের এই দুই রূপে অধিকাংশ দেশের মানুষ দিশাহারা হয়। ইংলণ্ডেও প্রথম যুদ্ধ বাধিতে তাহার কবিকুলর কোনো প্রেরণা পায় নাই, 'বেশি মন্দের ভয়ে কম মন্দের জন্য' প্রাণ দিবার সার্থকতা দেখে নাই। তখন যুদ্ধ লইয়া তাহাদের মনেও একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ যুদ্ধে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই একমাত্র সোবিয়েত দেশে. কারণ, সেখানে মানুষ শ্রেণীবিভক্ত নয়। তাই সোবিয়েত জনগণ সহজে বুঝিয়াছিল যুদ্ধ তাহাদের গৃহযুদ্ধ নয়, দেশরক্ষার যুদ্ধ। যুদ্ধ সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক দেশের লোকের মনে বিভ্রম আরও বেশি হইবার কথা— তাহাই হইয়াছে। আমরা জানি—ফ্যাশিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ এপিঠ-ওপিঠ; আমরা দেখি—সাম্রাজ্যবাদ এক চুলও পরিবর্তিত হয় নাই; আমরা মনে করি—এই যুদ্ধে জিতিয়া উহা বুঝি আরও নিষ্কণ্টক ও দুর্ধর্ষ হইবে। অতএব, 'ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব' বলিতে আমরা প্রেরণা পাই না। অথচ এই কথাও সত্য. আমাদের কোনো স্বাভাবিকচিত্ত দেশবাসীই ফাশিস্তদের বিজয় চাহে না। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুপরিচিত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুতীক্ষ্ণও। আমরা আজ দেখিতেছি পৃথিবীর জনশক্তি সত্যই অগ্রসব হইতেছে। তবুও ভাবিতে পারি না এশিয়ার এই কালা আদমীদের জন্য সেই

জনশক্তির মাথা ব্যথা আছে—অন্তত ব্রিটিশ বা ফরাসীর কোনো দরদ থাকিবে। এমনি করিয়া এই যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া আমাদের চেতনায় গভীর দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দেখা দিয়েছে।

এক-আধটা সহজ দৃষ্টান্ত লইলে হয়ত কথাটা বুঝিতে পারি। দেশীয় একটি কাপড়ের কলের মজুরকে ধরা যাউক (সম্প্রতি অতিরিক্ত মুনাফাদারী করিতেছিল বলিয়া আমাদের দশটি কল সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া কর্তৃপক্ষ উহাদের কর্তৃত্বভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে, ইহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।) যুদ্ধের প্রথম দিকে এই সব কল শতকরা এক শত হইতে তিন শত টাকা মুনাফা করিতেছিল। মাল যাইতেছিল যুদ্ধেই ; অথচ দেশের লোক তখনি ভুগিতেছিল বস্ত্র-দুর্ভিক্ষে। কিন্তু মজুরেরা মজুরীর উপর শতকরা সাড়ে বার টাকাও মাগ্‌গী ভাতা পায় নাই। যুদ্ধের সেই প্রথম দিকে এরূপ কোনো মজুরের তাহা হইলে কর্তব্য ছিল কি ? মাগ্‌গী ভাতা আদায় করা, ধর্মঘট করা ? শ্রেণী-সচেতন মজুরের পক্ষে তাহাই হয়ত পথ। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক দেশে মজুর তো অত সহজে শ্রেণী-সচেতন হইতে পারে না—সে শোনে দেশী মালিকের বদান্যতার কথা, জানে গান্ধীজীর ধর্মঘট সম্বন্ধে আপত্তি। আবার শ্রেণী-সচেতন হইলে ইহাও সে জানে যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আসল সৈনিক সে-ই, মজুর। কিন্তু মালিকেরাও 'জাতীয় ধনিক' ! কে বলিবে 'স্বদেশী কলে' ধর্মঘট কতটা বিপ্লবী মজুরের পক্ষে

সমীচীন? একদিকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা, অন্য দিকে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণা—দুই-এর দ্বন্দ্ব; তাহা সহজে কি সেই মজুর মিটাইতে পারে? না, আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই তাহা পারি?

ইহার পরে মনে করা যাক, বর্তমান যুদ্ধের রূপের কথা। প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন মজুরের পক্ষে—সাধারণভাবে গণতান্ত্রিকের পক্ষেও—ফ্যাশিজমের পরাজয় মুখ্য কর্তব্য। অতএব এই যুদ্ধে প্রধান কাজ ফ্যাশিস্তবিরোধী শক্তির উৎপাদন বাড়ানো। বস্ত্র-দুর্ভিক্ষে আমাদের দেশ আকুল; কাজেই দেশের জন্যও বস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। অথচ জিনিসপত্রের দাম তিনগুণ, মাগ্‌গী ভাতাও মজুরেরা পায় না, বরং পায় উল্টা অত্যাচার—তাহা হইলে কি করিবে এ অবস্থায় মজুরেরা? উৎপন্ন বস্ত্রও জনগণের হাতে পৌঁছিতেছে না, অন্য দিকে মজুরের নিজেরও অন্ন জুটিতেছে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে মজুরের চিত্তে যুদ্ধ সম্বন্ধে, উৎপাদন সম্বন্ধে, শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে—একই কালে যে কতরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়, কত অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা নিত্য দেখি। এমন শ্রমিক-জীবন এমন শ্রমিক মন ঔপন্যাসিকের হাতে এক চমৎকার উপকরণ —যদি ঔপন্যাসিক জানেন, সেই জীবন, দেখিয়া থাকেন তেমন মানুষকে—তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধকালে এইরূপ মানবতা-বোধ ও জাতীয়তাবোধ, সামাজিক স্বার্থ ও ফ্যাশিবাদ, আদর্শ ও বাস্তবের বহু রকমের দ্বন্দ্ব আমাদের সকলের মনেই আলোড়ন

সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু আলোড়ন সৃষ্টিই করে নাই, আমাদের জীবনকে তাহা আঘাতে আঘাতে জটিলও করিয়া তুলিয়াছে ;—যুদ্ধের শেষেই তাহা থামিয়া যাইবে, এমনও নয়। যে যত বড় শিল্পরসিক হোননা, বলিতে পারিবেন না এই সংঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

'মন্বন্তরে মরি নাই'?

অবশ্য শুধু যুদ্ধেও আমাদের জীবনের এতটা ভাঙা-গড়া শুরু হইত না। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার উপর যুদ্ধ আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে মন্বন্তর রূপে। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ যে কি, আজও তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। তুই-একটা মোটা সত্য দেখিতেছি: পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে (ভারতবর্ষ শুদ্ধ) প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোক মরিয়াছে। এমেরি সাহেবের হিসাবেই দেখি, মাত্র ছয় মাসে এক বঙ্গদেশেই আমরা মন্বন্তরে মরিলাম সাড়ে ছয় লক্ষ বাঙালী! তাহা ছাড়া কত লোক গৃহছাড়া হইয়াছে, কত স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, কত মানুষ জীবনী-শক্তিহীন হইয়াছে, তাহার কি ঠিকানা আছে? অন্যদিকে দেখি যাহারা যুদ্ধে মরে তাহারা দিয়া যায় জাতিকে একটা নৈতিক প্রেরণা, আর মন্বন্তর রাখিয়া যায় জাতির মনে একটা হতাশা। যুদ্ধ নাকি জাতির চেতনায় বিপ্লবের সূচনা করে। মন্বন্তরে এইরূপ

বিভ্রান্ত মানুষের মনই কি তবে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব নিরঙ্কুশ থাকিবে? এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য, মানুষের অকল্পিত দুর্ভাগ্য ও সমাজের এমন ভাঙন কি কোনো লেখক—এযুগে বাঁচিয়া থাকিয়া—বলিতে পারেন তিনি দেখেন নাই?

ইহারই মধ্যে—এই যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্বন্তরে মিলিয়া—আর একটি সত্য যাহা পরিষ্কার হইতেছে তাহাও এইখানেই স্মরণীয়। বাঙালী সমাজে বড়লোকেরা আরও বড় হইয়াছে,—সামান্য কিছু মধ্যবিত্তও ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে,—নিম্নবিত্তগণ বিত্তহীন হইয়াছে, আর গরীবেরা আরও গরীব হইয়াছে। অর্থাৎ, অর্থিক-বিন্যাসে বড়-ছোটর মধ্যখানে কেহ আজ আর টিকিতে পারিতেছে না, দুই দিকের দূরত্ব সুস্পষ্ট হইতেছে। ইহার ফলে হয়ত একদিন "প্রমাণ-সই" মজুরের দাবী বাড়িবে, ব্যক্তিকে ছাঁটাই করিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু আজ যাহা হইতেছে তাহা এই—আর্থিক বিপর্যয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব আরও আত্ম-সচেতন হইতেছে। এই দুর্ভাগ্য পরিবেষ্টিত মানুষ, তাহার সংগ্রাম, তাহার জয়—এবং পরাজয়ও—আজ শিল্পীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে বাধ্য। শিল্পীও তাহা একেবারে না দেখিয়া পারেন না—ট্রামে বাসে সর্বত্রই দেখিতেছেন নূতন বড়মানুষদের, এবং চারিদিকেই দেখিতেছেন নূতন নিঃস্বদেরও।

এই যুগের বাঙালী এই সব কারণে স্বভাবতই জটিল ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। শরৎচন্দ্র যে বাঙালীদের দেখিয়াছিলেন

তাহারা ছিল আধা-সামন্ত যুগের ব্যক্তি। কিন্তু যুদ্ধে, মন্বন্তরে, ধনাগমে ও রিক্ততায় মিলিয়া আজিকার বাঙালীর আরও বেশি বিচিত্র বিবর্তন ঘটিতেছে; —ক্রমেই তাহা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। যুদ্ধে-মন্বন্তরে মিলিয়া আজিকার বাঙালী শিল্পীকেও এই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে, চারিদিককার মানুষের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে, এই ভাঙা-সমাজের জটিলতা সম্বন্ধে, ব্যক্তির সম্ভাবনা ও তাহার বাধা সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। আজিকার শিল্পীরা সমাজ-সচেতন হইতেছে; এবং এই কারণেই উপন্যাস আজ তাহাদের প্রধান স্বাভাবিক সৃষ্টি-পথ।

শ্রাবণ, ১৩৫১

বিভূতিভূষণের জীয়ন-কাঠি

"২রা অক্টোবর, ১৯২৯, বুধবার, মহালয়া"—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন ('তৃণাঙ্কুর', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৮):

"আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আজ আমি আনন্দিত।

"আজ এই নির্জন নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বিকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী,—বিশ বৎসর পূর্বের সেই অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাহাদেরই প্রেরণা, তাহাদেরই সুর।

"আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাখীডাকা, তেলা-কুচা-ফুল-ফোটা, ছায়াভারা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে জানাতে চাই—

"ভুলি নি! ভুলি নি! যেখানেই থাকি ভুলি নি।...

তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বর-মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত, ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ সংযোগের থাকে।"

'পথের পাঁচালী' এই নিশ্চিন্দিপুরের কাব্য-কথা। ইং ১৯২৪ সন থেকে এ বই-এর ভাবনা বিভূতিভূষণকে পেয়ে বসে, 'অপরাজিত'-এ এসে তা শেষ হয় ১৯৩১ এর মার্চ মাসে (তৃণাঙ্কুর, ২য় সং, পৃঃ ৬৭-৬৮)। চব্বিশ বৎসর পরে ৩৪ বৎসরের অপু আবার তার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এল—পল্লীদেবীর কাছে সেদিনও তার প্রার্থনা, "অন্য কিছু চাইনে, এ গাঁয়ের বন-ঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশ-বাগানের ছায়ায় অবোধ উদ্‌গ্রীব স্বপ্নময় আমার যে সেই দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে, দেবী?" ('অপরাজিত, ২৬শ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ সং)।

'অপরাজিত জীবন-রহস্য' তখন অপু থেকে তার পুত্র কাজলের মধ্যে 'অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করছে।

১৯২৬ থেকে ১৯৩২-এর মার্চ এই সময়ের মধ্যে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্যটি বাঙলা-সাহিত্যে শিল্পিত করে তোলেন তা এই—বহিঃপ্রকৃতি এক পরম শ্রীময়ী শক্তি; তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সাধারণ জীবনও শ্রীহীন নয়; আর জীবন অপরাজেয়! বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—কারও মহত্বই খর্ব

না করে বলা যায়—বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের এই দান—অপূর্ব ও অপরূপ।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যে অসাধারণ সমাদর ও সম্বর্ধনা লাভ করেন। আর কোনো বাঙালী লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এমন শুভকামনা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। 'অপরাজিত'ও সেই জয়ধ্বনির মধ্যেই শেষ হয়—সে গ্রন্থ তখন ভালো করে যাচাই করবার মত অবসরও ছিল না মুগ্ধ বাঙালী পাঠকের। তারপর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের ছোট বড় নানা গল্প ও উপন্যাস বাঙালীর চিত্তভূমিকে এই দীর্ঘদিন ধরে সরস করে এসেছে। বিভূতিভূষণের যে পরিচয় 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতের' মারফত বাঙালী মনে স্থাপিত হয়েছিল, তার দুই-একটি দিক আরও পরিস্ফুট হয়েছে 'আরণ্যকে', 'দৃষ্টি-প্রদীপে' আর একেবারে শেষদিককার 'ইছামতীতে',—নিরাশ হননি কোনো পাঠক শেষ দিনও তার গল্পের রসে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র পরে বিভূতিভূষণের সেই পরিচয় আর নতুন হয়ে ওঠেনি, বাঙালী পাঠকের মনের আর কোনো নতুন তার স্পর্শ করেননি বিভূতিভূষণ। সেই একতারাটিতেই নতুন আঙুলে তার করুণ মধুর নতুন গৎ ফুটিয়ে তুলেছেন বার বার—বারে বারে একটি কথাই বলে গিয়েছেন—'ভুলি নি', 'ভুলি নি'; বারে বারে

একটি বিস্ময়ে ও বিশ্বাসেই অভিভূত হয়েছেন, 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে।'—অপুর পুনরাবৃত্তি হয় কাজলে। বারে বারে একটি কথাই জানিয়েছেন—তা সেই ৩৪ বৎসরের অপুর উপলব্ধি :—"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স্—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স। অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স্।" (অপরাজিত, পৃঃ ৪৩৫)

রোমান্সের এ জাতীয় চেতনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের দিন থেকেই সুপরিচিত। আমাদের সাহিত্যেও তা অজানা ছিল না। ছোট গল্পের (প্রাক্-সবুজপত্র যুগের) রবীন্দ্রনাথ ও 'ক্ষণিকার' রবীন্দ্রনাথ জীবনের সাধারণ তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও এই বিস্ময় আবিষ্কার করেছিলেন, প্রকাশও করেছিলেন। এ আবিষ্কার বিশেষ করে কবি-প্রতিভারই সাধনা। সেই শেওলা-ধরা পাথরের পার্শ্বেকার ছোট্ট প্রিমরোজটির মধ্যে চিন্তার অশ্রু-উৎস যে অফুরন্ত হয়ে আছে, তা কবি-দৃষ্টির অজ্ঞাত নয়। এই জাতীয় কবিদৃষ্টিতেই 'short and simple annals of the poor' আপনার অনাড়ম্বর সত্যে মহিমান্বিত ; যা সামান্য তাও অসামান্য। কিন্তু কথা-সাহিত্যে এ দৃষ্টি বড় সহজে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে না। কারণ, কথা-সাহিত্যের আশ্রয় বাস্তব পৃথিবী। আর এ পৃথিবী দ্বন্দ্বে-কোলাহলে জটিল। দারিদ্র্যও

সত্যই নির্মম। the poor যেমন হোক, the poor middle class বা নিম্নবিত্তের জীবন আরও জটিল এবং আরও দ্বন্দ্বময়—সব হারিয়েও সে 'সর্বহারা' নয়, 'সব পেয়েছির দেশের' সুরঙ্গ-সন্ধানী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বাঙলা সাহিত্যে এই বোধ নির্দয়রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—'গল্পগুচ্ছের' বাঙলাদেশ গল্পই শুধু। হয়ত সে সময়টা না মনে রাখলে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষ আবির্ভাব-ক্ষণ ও বাঙলা সাহিত্যে তার তাৎপর্যটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

বাঙলা শহুরে সাহিত্য

যে বাঙলা সাহিত্য উনিশ শতকে নবজন্ম লাভ করে তার জন্ম ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহিত্যের যাদুস্পর্শে। এ সাহিত্যের সৃষ্টি ইংরেজের শহর কলিকাতায়, কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করতেও সে কুণ্ঠিত ছিল। অথচ বাঙলা দেশের শতকরা ৮০টি লোক পল্লীবাসী, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালী পল্লী-সমাজে অধিকতর বিসারিত। এ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এ পল্লী-সমাজেরই অঙ্গ, আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তই আবার এই নতুন বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টা। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহিত্যাদর্শও ইংরেজির মারফত প্রাপ্ত, তা শহুরে-বণিক-ধনিক সভ্যতার দ্বারা উদ্‌ভাবিত। জীবিকার ক্ষেত্রেও এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সেই বণিক-ধনিক সভ্যতার টানেই শহরমুখী, কিন্তু জীবনের শত সম্পর্কে 'কলোনির' এই মধ্যবিত্ত বাঁধা

ভূমির সঙ্গে কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে, একটা ভাঙন-মুখী পল্লী-সভ্যতার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী-আওতার কাল্‌চারের একটা পরিহাস এই সাহিত্যজীবীরা। যারা শহরমুখো, জীবন ও ঐতিহ্যে তারই আবার পল্লীকেন্দ্রিত। সে মধ্যযুগের নিয়মে ও ঐতিহ্যে চালিত পল্লী-সমাজে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন-স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তি-চেতনা, সভ্য-জীবন-যাত্রার কোনো অবকাশ নেই। অথচ, বাস্তবজীবনে যে বাঁধা সেই কৃষি-সভ্যতারই নিগড়ে, সাম্রাজ্যবাদী দাপটে শিল্পে-বাণিজ্যে যার প্রবেশ নিষেধ, শিল্প-বাণিজ্যবাহী সভ্যতার আদর্শকে সেই কলোনির মধ্যবিত্ত গ্রহণ করবেই বা কিরূপে? জীবনাদর্শে তাই বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, আর একটা অবাস্তব ভাবালুতাও এ কারণে প্রশ্রয় পায়। একই কালে বাঙালী মধ্যবিত্তের মনে মমতা ও ক্ষোভ, দু'ই থাকে তার পল্লী-সমাজের জন্য। দু'ই অনিশ্চিত, দু'ই একটু অগভীর; একই কালে তা 'গল্পগুচ্ছের' বাঙলা দেশ, আবার শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। সেখানেই শ্রী, সরলতা, সৌন্দর্য, মাধুর্য; আবার সেখানেই ম্যালেরিয়া ও কুসংস্কারের ডিপো। এই পল্লী-সভ্যতাই আমাদের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত 'স্বদেশী' সমাজ; অথচ যে সভ্যতা, সে সমাজকে আর কিছুতেই 'আদর্শ' বলে ভাবা চলে না। তাই তার প্রতি অনুরাগ ও বিরাগ পর্যায় ক্রমে দেখা দেয় বাঙলা সাহিত্যিকেরও মনে।

✓'গল্পগুচ্ছের' যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রের' যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন, 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলের' ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর 'পল্লী-সমাজের' যুগের মধ্যপথে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নিরাবরণতাকে স্বাগত করে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন—প্রথম শৈলজানন্দ, পরে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতির' 'অতি আধুনিক' লেখকেরা। সৃষ্টির দিক থেকে 'কালি-কলমই' বেশি উল্লেখযোগ্য, যদিও হুজুগের হিসাবে 'কল্লোলই' বেশি উল্লেখিত হয়। বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিরারণতাবাদ নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাঙালী লেখকের চোখ বাস্তবের দিকে ফিরল। রোমান্স-এ তাদের অশ্রদ্ধা এসেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ (অবশ্য তার অর্থ রোমান্সের প্রতি বিমুখিতা নয়; একটা বর্ণচোরা রোমান্স-পিপাসাই ছিল তারও মূল)। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি। তাঁরা বাস্তবকে দেখছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার-করা ধারালো দৃষ্টিতে। তাই সেই পুঁথি-পড়া বাস্তবকে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন বাঙলা দেশের শহরে, বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পস্টতায়;—কদাচিৎ অস্পষ্ট পল্লী-সমাজে✓ যে বাঙলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী-কেন্দ্রিত সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব-সাহিত্য শহর-কেন্দ্রিত; প্রয়াসেও শতকরা ততো ভাগই হল

মূল্যহীন। কিন্তু তা আরও মূল্যহীন হয় 'অতি-আধুনিকদের' উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব-চরিত্র পরিকল্পনার জন্য। তাই বাঙলা কথাসাহিত্যের মোড় বাস্তবের দিকে ঘুরতে না-ঘুরতেই অবাস্তবের চোরাবালিতে তখন আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই মাটি ছিল কম, মোটামুটি একশত বৎসর (১৮১৭-১৯১৮) তবু চলেছিল; তারপরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে।

এমনি নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তির সময়ে—'যোগাযোগ' শেষ হয়েছে 'বিচিত্রায়', 'শেষের কবিতা' শেষ হয়েছে 'প্রবাসীতে',—'পথের পাঁচালী' আরম্ভ হল 'বিচিত্রায়'। বাঙালী পাঠকের মন এক নতুন রসে অভিষিক্ত হল। আরও দুই বৎসর পরে 'বিচিত্রার' পাতা থেকে বেশ খানিকটা ঝাড়াই-বাছাই হয়ে প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। স্মরণ করবার মত কথা তারপরে বাঙলা দেশের পাঠক সমাজের সমস্বরে বিভূতিভূষণের স্বাগতীকরণ।

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে 'সাহিত্য সেবক সমিতির' অনুষ্ঠিত 'পথের পাঁচালী' সম্বর্ধনা সভায় ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও বিদগ্ধজনের অভাব ছিল না। কথারও অভাব হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটু সলজ্জ সংকোচে জানান, "আমি চিরদিনের কলকাতার মানুষ। বাঙলার পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি

করতে পারি না। কিন্তু বেশ একটা মমতা বোধ করি তার জন্য, তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাঁচালীর' অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।",

চিরদিনের কলকাতার মানুষ হলেও কলকাতাই যে ইংরেজের—এখন হয়ত আবার মারোয়াড়ী-ভাটিয়ারও। বাঙলার পল্লীর জন্য তাই একটা অশ্রু-সজল মমত্ব-বোধ—nostalgia—এই কলকাতার মানুষদেরও মনে জমা আছে, আর পল্লীত্যাগী শহরমুখো শিক্ষিতের মনে রয়েছে সেই স্মৃতি। ম্যালেরিয়ার ডিপো এই এঁদো-পুকুর ও বাঁশঝাড়ের গ্রাম, তা ঠিক। দলাদলি, কুড়েমি ও গোঁড়ামিতে তা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তাও সত্য। কিন্তু 'আরও সত্য' একটা আছে তাও বুঝতাম। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রলোকের ওপার থেকে এই পল্লীর উপরে তাঁর কবি-দৃষ্টির কিরণ রেখাটি পাত করে আমাদের সেই সত্য জানিয়েছিলেন। তবু জানতাম সে দেখা কাব্য-চন্দ্রিকার কাক-জ্যোৎস্নায় দেখা বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন। তাই সেই দর্শনে একটা অর্ধ-অবিশ্বাসও জাগ্রত থেকে যায়। কিন্তু 'পথের পাঁচালীতে' এখন আমরা সেই পল্লীপ্রকৃতিতে দেখলাম—ঠিক চন্দ্রলোকের মানুষের চোখে নয়। বরং অতিপরিচিত এই বাঙলা দেশের গ্রাম থেকেই সেই গ্রাম্য পথ-রেখাটি চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গিয়েছে : তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়ে সে পথ—মোটা মোটা

গুলঞ্চ-লতা দুলানো থলো থলো বন-চালতার ফল চারধারে; আমবাগানে এসে শেষ হয়েও শেষ হয়নি। আবার এ-গাছের ও-গাছের তলা দিয়ে চলে কুঠির মাঠের ধার বেয়ে—সোনা ডাঙার রাস্তাও শুধু নয়, মাধবপুর-দশঘরা হয়ে ধলচিতার খেয়াঘাটে তা থামেনি—গিয়েছে আরও অনেক দূরে—রামায়ণ মহাভারতের দেশে (পৃঃ ৬৪), ঐ অশথ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনো মাটি হতে রথের চাকা দু'হাতে প্রাণপণে টেনে তুলছে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র, কর্ণ। (পৃঃ ৩৪)

কিন্তু সে পথ সেই আকাশেই শুধু উঠে যায়নি—গল্পগুচ্ছের পথ যেখান নেমে এসেছে নদীর ধারের, শ্যামল গ্রামে। এই "সুড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ-গাছের ও-গাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুধুলের লতা কোথায় কোন ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার নজরে আনে।" (পৃঃ ৮৮)

পল্লীর পুনরাবিষ্কার

না, এ পথ সেই পৃথিবী-ছাড়া রোমান্সের পথ নয়—কল্পলোকের নাম-না-জানা গাছে লতায়-পাতায় যা ছায়াচ্ছন্ন।

প্রত্যেকটি গাছ লতা আর ফুল এখানে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিতে নাম নিয়ে উপস্থিত—কোনো ফুল, কোনো গাছ, কোনো লতা শুধু 'নাম-না-জানা' ফুল বলে, গাছ বলে, লতা বলে,—একাকার হয়ে যায়নি। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণার বা শুধু বোটানির বইতেই আর আবদ্ধ রইল না। বিভূতিভূষণের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে প্রত্যেকেই তার বিচিত্র সত্তা আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে জন্মলাভ করল। তাই চিরদিনের কলকাতার মানুষ বা চিরদিনের পল্লী-কেন্দ্রিক শহরমুখো বাঙালীর চেতনায় তাদের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত হল। আর তা উদ্‌ঘাটিত হল বিভূতিভূষণের আন্তরিক অনুরাগের ও রোমান্টিক বিস্ময়-রসের মায়া-কাজল মেখে। প্রকৃতি বলে একটা কিছু যে আছে—আর তা আছে শুধু 'ডেজি', 'ডেফো-ডিল,' 'প্রিম্‌রোজে' নয়, শুধু পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে-নদীসৈকতে নয়, সাঁওতাল পরগণায় বা দার্জিলিং-এও নয়,—আছে তা আমা-দের ঘরের দুয়োরে—ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জঙ্গলে এঁদো, পুকুরের পাশে, আশ্‌শ্যাওড়ার বনে, তেলাকুচার, ঘেঁটু ফুলের বিশিষ্ট গন্ধে—সেদিন আমাদের হয়ে আমাদের এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন বিভূতিভূষণ। বাঙলা পল্লীপ্রকৃতির প্রতি যে মমতা আমাদের ছিল তা এক মুহূর্তে এইখানে আত্মোপলব্ধি করলে। আর শহুরে সভ্যতায় আমাদের কোনো সৃষ্টি সার্থকতা নেই বলেই এই শহর-ত্যাগী পল্লী-প্রশান্তিতে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করলাম

আরও বেশি—হোন্ তিনি কলকাতার মানুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা কলকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জের নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

✓এইরূপ দ্বিতীয় এক আবিষ্কার—আমাদের ঘুমন্ত চেতনার নতুন জাগরণ—সেই নিশ্চিন্দিপুরের অপু-দুর্গার সঙ্গে পরিচয়। অপু 'রামের সুমতির' রামের মত নয়, অথচ তেমনি সত্য। বৈশাখের ঝড়ে সে দিদির সঙ্গে আম কুড়োতে ছোটে, নোনাফল পেড়ে খেয়ে অপার তৃপ্তি লাভ করে, দু'জনায় পানফল তুলতে গিয়ে দিদিকে টেনে ধরে—ভালো ফলারের নামে সহজেই লুব্ধ হয় তার দরিদ্র রসনা, সহজেই তেমনি ছাঁদা বেঁধে আনে লুচি আর খাবার। চুরি করে আনে পুঁতির মালা তার বোন, চুরি করে আনে তেমনি সহজ লোভে সিন্দুরের সোনার কৌটা। দিদি আর মায়ের সহজ মমতায় অপুর জীবন যখন ঘেরা, তখন নিশ্চিন্দিপুরের বন-ঝোপ এই শিশুকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় নব নব বিস্ময় ও অনুভূতির দিকে—সে ডাইনী বুড়ীর ভয়ে ছুটে পালায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে তার বড় ভয়, রেলপথের সিধা লোহা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে আর ঠিকানা পায় না এ পৃথিবীর, 'সীতার বনবাসের' সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরির, (পৃঃ ৬৪) ঝঙ্কার-জড়ানো শব্দ-সঙ্গীতে আর বারোয়ারী তলায় যাত্রার কাহিনীতে মানব-কল্পনার অতুলক্ষ্মীর দেহোদ্ভাস সে দেখতে পায়। বাঙালী শিশু মনের

এ রহস্য সত্য,—শহর-পালিত বাঙালী বালকের পক্ষেও সত্য, আর গ্রামে-মানুষ বাঙালী বালকের পক্ষেও সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের সৃষ্টি-চমৎকারিত্বেই এক মুহূর্তে এই সত্য আমরা বাঙালী পাঠকেরা আবিষ্কার করলাম। ইতরতা, নিষ্ঠুরতা, ছেঁচড়ামো, কাঙালপনা, vulgarityই যে বাঙালী পল্লী-সমাজের একমাত্র সত্য নয়, এ কথা অবশ্য আমরা জানতাম। শরৎচন্দ্রও এই কথা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ভূমিকা-রচনা করেছিলেন ('রামের সুমতি,' 'বিন্দুর ছেলে,' নিষ্কৃতি' পর্যন্ত)। কিন্তু সর্বজয়া-অপু-দুর্গার সংসারের মধ্যে—short and simple annals of the poor নয় শুধু, poor middle classএর সমস্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও—কতখানি অশ্রুসজল মাধুর্য ও মমতা, মানবিক মায়া ও রোমান্সের বিস্ময় যে সর্বদাই সঞ্চিত—এই বিস্ময়রসের সত্যটা বিভূতিভূষণের মত এমন করে আজ পর্যন্ত কেউ বাঙলা কথা-সাহিত্যে আবিষ্কার করতে পারেননি। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথও বোট আর কাছারি-বাড়ি থেকেই এই বিস্ময়ের আভাস দিয়েছেন। সর্বজয়ার সংসারের মাঝখানে বসে আমকুড়োন, কাঙালপনা, হ্যাংলামো প্রভৃতি প্রতিদিনের পল্লী-জীবনের অতিপরিচিত তুচ্ছতাকে এমন খুঁটে খুঁটে প্রকাশ করতে তিনি সাহসী হননি; হয়ত তা তাঁর জানাও ছিল না। এই অতি-পরিচিত তুচ্ছতা জানা থাকলেও তার এই অন্তর্নিহিত সত্যে শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না; এই সকরুণ বিস্ময়েও

তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। কারণ, শরৎচন্দ্র বাস্তব চেতনায় অনুভাবিত কথাকার আর বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কথাকার; শরৎচন্দ্রের প্রধান বক্তব্য—সামাজিক সম্পর্কে মানুষের রূপ; আর বিভূতিভূষণের প্রধান বক্তব্য—সামান্যের মধ্যে অসামান্যের অনুভূতি।

জীবন-প্রীতি ও জীবন-ভীতি

'পথের পাঁচালী' বাস্তব-বিমুখ মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই রোমান্স-পিপাসী তারটিই স্পর্শ করল। কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, শরৎচন্দ্রের বাস্তব-সাক্ষ্যকেও তা একেবারে অস্বীকার করল না। রোমান্সের প্রধান কথা—বিস্ময়ের বোধন। কিন্তু সে বিস্ময় অসম্ভব দেশের অসম্ভব কথাকে আশ্রয় করে রচিত করা আর আবশ্যক নেই। 'পথের পাঁচালীর' বিস্ময় পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আবিষ্কারে; সহজের মধ্যে স্বপ্নময়তার সঞ্চারে; আর সামান্যের মধ্য থেকে অসামান্যের উদ্‌ঘাটনে। এই বিস্ময়-বোধন বিশেষ করে সার্থক হল এই জন্য যে, 'পথের পাঁচালী' নিশ্চিন্দিপুরের কথা হলেও শিশুর চোখ দিয়ে দেখা নিশ্চিন্দিপুরের কথা—আর বিস্ময় শিশু-মনেরই প্রধান রস, প্রায় তার নিজস্ব ধর্ম। তাই, 'পথের পাঁচালী' আসলে পল্লী-সমাজের কথা নয়—মাত্র একটি পল্লীগৃহের কথা; এবং মূলতঃ অপু-দুর্গার মত অনুভূতি-প্রবণ কল্পনা-কুশল শিশু-লীলারই কাব্য-কথা। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজের' সত্যকে অস্বীকার সে

করে না, তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় পল্লীজীবনের ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের তেমনি সত্যনিষ্ঠ, অথচ রোমান্সের মায়া-মাখানো আর একটি রূপ। শরৎচন্দ্রকে অসত্য বলতে পারব না। কিন্তু সাধ্য কি বলব—এই শিশু-নয়নের দৃষ্টিতে নিশ্চিন্দিপুরের যতটুকু দেখেছি তা মিথ্যা? কি করে বলব, বাঙলাদেশে এই নিশ্চিন্দিপুর আর তার অপু-দুর্গা শুধু কাল্পনিক? মিথ্যা আমাদের এই বিস্ময়বোধ?

কিন্তু এই বিস্ময়-বোধ যে কতখানি কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চায় তার পরিচয় পাওয়া গেল এর পর। 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালীরই' পরিণতি। প্রথম যখন তা প্রকাশিত হয় (১৯৩২) তখন তার বিচার সম্ভব ছিল না। বরং একটা নিঃশ্বাস ফেলে আরাম উপভোগ করলেন পাঠকেরা যখন ২৪ বৎসর পরে অপু উপলব্ধি করলে নিশ্চিন্দিপুরেই তার নিজ বাসভূমি। অবশ্য 'অপরাজিত' জীবন-রহস্য তাকে টেনে নিয়েছিল দূরে—শহরে, গ্রামে, অরণ্যে—আর পরম বিস্ময়কর মানুষের জগতে। এই মানুষের জগতেই জীবনের সত্য পরিচয় আর জীবনের সত্য পরিণতি। যা 'পথের পাঁচালী' তা সেখানে দাশু রায়ের ছড়া ছেড়ে পরিণত হয় মহাকাব্যের মহিমায়। 'অপরাজিত জীবনরহস্য' সেখানে 'আত্মপ্রকাশ' করে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অপরাজয়ের সৃষ্টির সঙ্কেতে। তাও বিস্ময়, বরং তা'ই পরম বিস্ময়। কিন্তু এ পরম বিস্ময় শিশুর বিমুগ্ধ-

বিস্ময় নয় ; দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মথিত মানব-সৃষ্টির মহান্ বিস্ময়। অথচ মানুষের এই জগতে অপু বয়সে বাড়ে, বাড়ে না জীবন-বোধ ; তাই বাড়ে না তার বিস্ময়-বোধও। এ সমালোচনা তাই অতি সত্য 'অপরাজিতের' অপু অপরাজিত নয়, 'তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত।' (নীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯, পৃঃ ৩২৮)। অপু অনেক কিছুই বলে, অনেক ভাবে, অনেক কল্পনা করে—কিন্তু করে না জীবনের বিকাশ। তার চারিদিকে মানুষ, চারিদিকে জটিলতা, চারিদিকে সেই চক্রব্যূহের অক্ষৌহিণী। কিন্তু মানুষের এই পৃথিবীতে সেই সব দ্বন্দ্বের পাশ কাটিয়েই অপু চায় জীবন। অথচ 'জীবন দ্বন্দ্বময়।' তাই সম্মুখের জীবনকেই পাশ কাটিয়ে অপু ফিরে যায় অতীত জীবনে—স্মৃতিতে। ৩৪ বৎসরের ক্রমবর্ধিত যৌবনেও সে পেতে চায় সেই শিশুতীর্থের আশ্রয়,—বাহ্যত তা নিশ্চিন্দিপুর, কিংবা বহিঃপ্রকৃতির অন্য কোনো কোল—যেমন, অমর-কণ্টকের বিপুল অরণ্যাণী। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগটা অপুর আন্তরিক, তাই অরণ্যেও সে স্বচ্ছন্দ ;—সভ্যতার শৈশবে অরণ্যই তো ছিল মানুষের মাতৃক্রোড়। অমরকণ্টক তাই চির-অপরিণত অপুর সেই আত্ম-নিবেদনের সুরে গাঁথা এক মহান্ অরণ্য স্তব—(পৃঃ ৩৬৪)। 'আরণ্যকে' তারই রোমন্থন চল্‌ল পাতার পর পাতা। দু'খানেই আছে সভ্যতার শৈশবের সেই শিশু-মানবের

বিস্ময় ও গাম্ভীর্য ; আছে পরিণত সভ্যতার মানুষের পক্ষে সেই বিস্ময়-বোধন, আশ্রয়-অন্বেষণ।

জীবনের বিপুল স্রোত অপুকে সামনেও টানছে—টানছে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের বোঝাপাড়ায়। অথচ চিরশিশু অপু আঁকড়ে ধরে এই তার আশ্রয়ভূমিকে। অপু শিশুই থাকতে চায় ; দ্বন্দ্বময় জীবনকে সে চায় না, সম্ভবত চিনেও না। তার শিশুমন শেষ পর্যন্ত তাই শুধু স্মৃতিমন্থনেও আশ্রয় পায় না, আশ্রয় খোঁজে তখন অতি-প্রাকৃতিক স্বপ্নে, ভাব-বিলাসে। বিস্ময়-সন্ধানী দৃষ্টি তখন চায় 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান'।

দ্বন্দ্বভীত মানুষ আসলে জীবন-ভীত মানুষ। আপনার শিশুজীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের সাহিত্য-জীবন। 'পথের পাঁচালীর' কীর্তিকে তাই আর ছাড়িয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের কোনো কৃতিত্ব।

বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব

কোনো লেখকের কীর্তি কী, সেইটাই বড় কথা। কী তাঁর অনায়ত্ত বা অসাধ্য, তা তত বড় কথা নয়। কিন্তু যা তার সাহিত্য-জীবনের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তা সর্বক্ষণই স্মরণ করা চলে। এ কথা মনে রাখা তাই অন্যায় নয়—বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অনুরাগে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় গাম্ভীর্য ও মহিমার সন্ধান করা চলে না ; সেই awe and adoration বিভূতিভূষণের নেই—

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ঐকান্তিকতা নেই। আর, 'পল্লী বনাম শহরের' প্রশ্নে বিভূতিভূষণের যে আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনেকটাই তা আবেগ-মমতা। কারণ, এ প্রশ্ন বাঙালী জীবনে ওঠেইনি এখনো। শিল্পোন্নত সমাজ 'পল্লী বনাম শহর' এই প্রশ্নের সমাধান করছে নতুন বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতান্ত্রিক শিল্পাঙ্গিক বিন্যাসে। কিন্তু পল্লীপ্রকৃতি বা অরণ্যপ্রকৃতি, যারই কোলে বিভূতিভূষণ আশ্রয় গ্রহণ করুন তিনি সে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন মাতৃক্রোড় ছাড়তে চান না বলে; জীবনের জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিমুখ। তাই তিনি মানুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত লীলার কবি হতে পারেননি; হয়েছেন গোষ্ঠলীলার কবি। আর এরূপ দ্বন্দ্ব-শঙ্কিত বলেই তাঁর বাঙলার পল্লী-চিত্রেও নেই কৃষক চরিত্র। কৃষিক্ষেত্রেরও চিহ্ন তাতে নেই, আছে পড়ো ভিটে আর ঝোপ-ঝাড়। এই জন্যই তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত মনের ক্ষোভ-বেদনা-বিদ্রোহেও নির্বাক—অথচ এই বিস্ময়রসের অপেক্ষা তাদের জীবনের সেই রৌদ্র-বীভৎস রসও কম সত্য নয়। সেই ক্ষোভ থেকে তাঁর মতে নিস্তারের পথ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'—অপস্মার, জীবন-সংগ্রাম নয়, সমাজের বিপ্লবী বিকাশ নয়।

দ্বন্দ্বেই যে ভীত, দ্বন্দ্বময় মানবপ্রকৃতি ও দ্বন্দ্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকেই বা সে তবে উপলব্ধি করেছে কতখানি? বিভূতিভূষণের জীবনবোধ শিশুর জীবন-বোধ। শুধু তাও নয়। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত জীবন-রহস্যের যে 'আত্মপ্রকাশ'

দেখে মুগ্ধ, তাঁর দৃষ্টিতে সেই জীবন-রহস্য বা Life Force শুধুই অপু থেকে কাজলে আবার 'আত্মপ্রকাশ' করে। কিন্তু নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে এই জীবন-রহস্য শুধু 'আত্মপ্রকাশ' করে না, আত্মবিকাশ করে, এ সত্যও বিভূতিভূষণের উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট নয়। 'পথের পাঁচালীর' পথটা তাই একটা জীবন-চক্রের বৃত্তখণ্ড মাত্র। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা ক্রমোদ্‌গতি লাভ করে না। জীবন সেখানে পাক খায়, এগোয় না। তাই বিভূতিভূষণ কখনো মানুষকে দেখেন না স্রষ্টা হিসাবে —যে মানুষ বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে, আর পরিবর্তিত হয় সঙ্গে সঙ্গে যার অন্তঃপ্রকৃতিও; যে শুধু বিমুগ্ধ শিশু নয়, সচেতন স্রষ্টাও। এ যুগের মানব-সভ্যতার এই বৃহত্তম আবিষ্কার ও জীবনের এই বিরাট রোমান্স বিভূতিভূষণের অগোচর।

জীবনের তবু যে পরিচয়খানি বিভূতিভূষণ লাভ করেছিলেন তা 'পথের পাঁচালীর' পরেও দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে বহু উপন্যাসে ও ডায়েরির অজস্র লেখায় তিনি উৎসারিত করে দিয়েছেন। তাতে কত মানুষ, কত ঘটনা, কত অলৌকিক তত্ত্ব, আর কত প্রতিদিনের সত্য পরিচিতি! বাঙলা সাহিত্যে তাঁর সেই গল্প উপন্যাস ডায়েরির পাতা—একটা কৃতিত্ব। অবশ্য যে বিস্ময় 'পথের পাঁচালীতে' তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার পর আর কোনো নতুন বিস্ময় বা নতুন সত্যের তিনি সন্ধান দিতে পারেননি। সেই 'মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারই' বিভিন্ন বিচিত্র সুর-

সংযোগের মধ্যেও বরাবরই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, এই প্রতিশ্রুতি সত্যিই তিনি পালন করেছেন। বারে বারে স্মৃতিমন্থনে বা জীবনাবর্তনে ফিরে ফিরে এসেছে সেই নিশ্চিন্দিপুরের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু জীবন তো পুনরুক্তি করে না। আর সাহিত্যেও এরূপ পুনরুক্তি একটা অভ্যাসের যান্ত্রিকতা, কিংবা আত্মগত দুর্বলতা। জীবনের সুনিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ এ নয়; শিল্প হিসাবেও তা সীমাবদ্ধতার প্রমাণ।

সে সব অসংখ্য পুনরাবৃত্তি বাগ্‌-বাহুল্য, গঠন-শিথিল, ও জীবন-সংগ্রামে বিমুখিতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের পরবর্তী প্রত্যেকখানি গ্রন্থকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি—এমনি তাঁর লিপিকুশলতা ও কলাকুশলতা; এমনি মাধুর্য তাঁর কল্পনাকুশল কবিমনের; এমনি অক্লান্ত তাঁর চিন্তা আর অফুরন্ত তাঁর চরিত্রসৃষ্টি—ক্ষোভহীন, গ্লানিহীন এক মানবীয় মমতায় অভিষিক্ত তাঁর পরিচিত জগৎ। তাঁর সাহিত্য একটি বড় সত্যের স্বাক্ষর—এই সত্যই সে সাহিত্যের জীবনকাঠি। "অতি হীনতম তুচ্ছতম এক ঘেয়ে জীবনও রোমান্স।" কারণ, তা জীবন, আর তাই সৃষ্টিময়। এবং জীবনের চরম বিস্ময় সেখানে যেখানে হীনতাকে তুচ্ছতাকে একঘেয়েমিকে সে মেনে না নিয়ে, সদর্পে তা অপসারিত করে সকল মানুষের এই সৃষ্টিশক্তিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে; কোনো জীবনকেই হীন, তুচ্ছ থাকতে দেয় না।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাস

বাঙলা কথা-সাহিত্য ক্রমেই যে জীবন্ত কালের সাক্ষী হয়ে উঠছে তার এক প্রধান প্রমাণ বাঙলার বর্তমান সময়কার 'রাজনৈতিক উপন্যাস'। মানুষ যে 'রাজনৈতিক জীব' এ্যারিষ্টটলের আমল থেকে এই কথাটা জানা থাকলেও সাহিত্যে এই কথাটা মানা সহজ হয়নি।

রাজনৈতিক উপন্যাসের পুরাতন পর্ব

'রাজনৈতিক উপন্যাস' বলতেই অনেকে আপত্তি করেন—উপন্যাসের বিচার হবে উপন্যাস বলে, তার রাজনীতির জন্য নয়। এ কথা অবশ্য অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যাও। জীবনকে যারা সমগ্র করে দেখতে চান, পেতে চান, এ্যারিষ্টটলের আমলেও তাঁরা বুঝেছিলেন, রাজনীতিকে তাঁদের ছেঁটে ফেলে দিলে চলে না। আর রাজনীতিকেও যাঁরা সমগ্র করে পেতে চান তাঁরাও একালে জানেন, জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে তা গ্রহণ না করলে রাজনীতিও হয় অচল, অনর্থের কারণ। কারণ, রাজনীতি হচ্ছে সমাজের রূপায়ন বিদ্যা, তার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। কিন্তু এ আলোচনা এ উপলক্ষে এখানে নিরর্থক। সহজভাবেই আমরা মানি, উপন্যাসের মুখ্য উপাদান ব্যক্তি মানুষের জীবন; কিন্তু ব্যক্তিসত্তার পরিচয়-কথা হলেও সমাজ-জীবনের ও রাজনৈতিক

জীবনের উপরে অধিকাংশ উপন্যাসেরই একটা পরোক্ষ দান ও প্রভাব থাকে। আবার অধিকাংশ উপন্যাসই তেমনি অজ্ঞাতে বহন করে সমাজনীতির ও রাজনীতির ছাপ। "রাজনৈতিক উপন্যাস" তবু তাকেই বলি যাতে সমসাময়িক সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রচেষ্টার ছাপ স্পষ্ট ; তা পরোক্ষ হলেও অচেতন নয়। অবশ্য তাতেও মাত্রার তারতম্য ঘটে, কোথাও তা বেশি স্পষ্ট হতে পারে, কোথাও বা কম স্পষ্ট। অবশ্য খাঁটি রাজনৈতিক উপন্যাসে শুধু এই ছাপ থাকাই যথেষ্ট নয়। তাতে দেখা যাবে রাজনীতি এক বৃহৎ সত্যের অঙ্গীকার রূপে কেমন করে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, জীবনকে তীব্র, চূর্ণ বা পূর্ণ করে তোলে, কেমন করে তা মানুষে-মানুষে সম্পর্ককে বিচিত্রতর করে তোলে—এক কথায়, কেমন করে তা 'চরিত্রকে' করে বিকশিত।

স্মরণ করা উচিত যে, রাজনৈতিক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যেও একেবারে নতুন নয়। অন্তত বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' থেকে আমাদের ভাষায় রাজনৈতিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু তবু যা বিস্ময়কর তা এই : তারপর থেকে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে ও চিন্তায় রাজনৈতিক প্রয়াস ও আলোচনা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, অথচ সে তুলনায় বাঙলা কথা-সাহিত্যে বাঙালীর জীবনের এদিকের ছাপ পড়ে নি। এর কারণ অবশ্য আমরা জানি। যথা, প্রথমত, পরাধীন

দেশে রাজনীতি হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিস; কারণ তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট। দ্বিতীয়ত, ও বস্তু যাকে স্পর্শ করে তার জীবনে সাধারণ শান্তি, স্বস্তি, আরাম আয়েস আর সহজলভ্য হয় না। তাই পরাধীন দেশে যারা বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী ও গুণী, তাঁরা রাজনীতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধ্যানের আসন খুইয়ে ফেলতে চাননা। নিছক পুলিশ, ফৌজদারী ও জেলের ভয়ও হয় তো জানা বা অজানায় তাঁদের এই মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে। তারপরে অবশ্য 'আর্ট', 'আনন্দ', 'সৃষ্টি', 'নিত্যকাল' প্রভৃতির দাবিও অজুহাত হিসাবে মনে জুটে যায়। সম্ভবত, এজন্যই বাঙালী জীবনের এদিককে বাঙালী ঔপন্যাসিকরা সাধারণত নেপথ্যে রেখে গিয়েছেন। তৃতীয় কারণও অবশ্য ছিল। শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক যে-রাজনীতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন সে ছিল বিদ্রোহের রাজনীতি; আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি নয়, বরং তথাকথিত সন্ত্রাসকের রাজনীতি। বিপ্লবীদের সাহস, দুর্গত-সেবা, আত্মত্যাগ—এ সবে বাঙালীর একটা আস্থা ছিল। অথচ ও জিনিসকে সাহিত্যে সত্যভাবে লিখতে গেলে দু'দিন আগেও বিপদের অন্ত ছিল না। এজন্যও সাধারণ প্রাণবান ঔপন্যাসিকরা তাঁদের নায়কদের এখানে ওখানে পুলিসের হাতে নিপীড়িত করেই এই রাজনৈতিক কর্ম্মীদের প্রতি দেশের দরদ জানাতেন, তার বেশি আর অগ্রসর হতেন না। তবু সমাজ-সত্য তার অমোঘ দাবি নিয়ে এই ভয় ভাবনার দেয়াল

ভেঙে মাঝে মাঝে প্রাণবান ও শক্তিমান সাহিত্যিকের লেখায় এসে উঁকি দিত। তারই প্রমাণ 'গোরা,' তারই প্রমাণ 'পথের দাবী,' প্রমাণ 'চার অধ্যায়।' 'স্বদেশী যুগ', অসহযোগ, ১৯৩০'এর বিদ্রোহ-প্রয়াস—বাঙালীর জীবনের এই এক একটা সুতীব্র রাজনৈতিক প্রকাশ বাঙালী স্রষ্টাকে যেভাবে ভাবিত, মথিত করেছে, তার খানিকটা আভাস তাঁরা রেখেছেন তাঁদের এসব উপন্যাসে। এসবকে রাজনৈতিক উপন্যাস বল্‌লে নিশ্চয়ই সাহিত্যি রসিক রাগ করবেন না। কারণ, রাজনীতির ছাপ এসব গ্রন্থে পরোক্ষ নয়, প্রায় প্রত্যক্ষ।

রাজনৈতিক উপন্যাসের নতুন পর্ব

কিন্তু বাঙলায় রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারা বিশেষ করে প্রবল হতে আরম্ভ করেছে ১৯৩০।৩৫এর পরে। হয়ত তার কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলন আজ এতটা সবল হয়েছে যে, লেখকের এদিকে সাহস বেড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, লেখকেরা বুঝেছেন, জীবনে যে জিনিস তাঁদের এত প্রত্যক্ষ লেখায় তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা একটা কৃত্রিম চেষ্টা। তৃতীয়ত, একদল সাহিত্যিক-রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের জীবন-সত্যকে স্বীকার করতে একেববারে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। এঁরা অনেকেই এখন সাম্যবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তবু সাহিত্যের সাধারণ মান রক্ষা করার প্রয়োজন এঁরাও স্বীকার করেন। এঁদের প্রাণশক্তি ও

দৃষ্টিশক্তি দুয়ে মিলে অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের থেকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে। চতুর্থত, রাজনৈতিক প্রয়াস প্রবল হওয়াতে এদিকে পাঠকদের দাবিও ক্রমে বেড়ে গিয়েছে—লেখক ও প্রকাশক নিতান্ত বৈষয়িক কারণেও আজ তা বুঝতে বাধ্য। এ সব কারণে বাঙলার কথা-সাহিত্য ক্রমশই রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে কথার উপকরণ হিসাবে মর্যাদা দিতে শুরু করেছে।

সমকালীন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানই সর্বাগ্রে। কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাস যে কত সহজগ্রাহ্য বিষয় বস্তু হয়েছে তার প্রমাণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গল্প-উপন্যাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা, এমন কি, রাজনীতি বিমুখ বনফুল'রে 'সপ্তর্ষি'। বনফুল শিল্পদৃষ্টি নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করতে অভ্যস্ত; সমাজ-জীবনের সমস্যা তাঁকে আলোড়িত করে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁরও মনে আজ এই মহাযুদ্ধের কালে জিজ্ঞাসা জেগেছে। তিনি তা উপস্থিত করেছেন 'সপ্তর্ষিতে' তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে—অভিজ্ঞতা-হীন কলা-কুশলতার সহায়ে। রাজনৈতিক উপন্যাসের এই নতুন ধারা তুচ্ছ নয়; সে ধারায় যে জোয়ার আসছে তারই আর এক প্রমাণ শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'র আকস্মিক আবির্ভাব। সরোজ রায় চৌধুরী ও তারাশঙ্করের কথা আমরা ভুলিনি, কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনের একটি বিশেষ পর্বকে. অথবা তার বিশেষ সত্যকে, 'জাগরী'র পূর্বে বাঙলা ভাবায় এমন

করে আর কোথাও প্রকাশিত করা হয় নি। 'জাগরীর' কথা তাই বিশেষ করে আলোচনা করা উচিত।

'জাগরীর' কথা

'জাগরী' উপন্যাসের আখ্যান-ভাগ এরূপ : ১৯৪৩ সালের মে (?) মাসের একটি রাত্রির কথা—রাত পোহাতে না পোহাতে পূর্ণিয়া জেলে ফাঁসি হবে ১৯৪২এর আগষ্ট আন্দোলনের এক বিদ্রোহী কর্মীর। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুলের হেড মাষ্টার ; তিনি অসহযোগে যোগ দেন ; একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী, গান্ধী আশ্রম চালান। সে রাত্রিতে তিনি আছেন সেই জেলের 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে।' 'মা' বাঙালী স্ত্রীর মতোই স্বামীর পথ অনুসরণ করেছেন, স্বামীর মত গ্রহণ করতে পারুন বা না পারুন ; সে রাত্রিতে তিনি আছেন সেই জেলের 'আউরাৎ কিতায়'। এই রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ভাবিত পরিবারের বড় ছেলে বিলু জেল আর সংগ্রামের পথে পথে চলে, শেষে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির সভ্য হয়ে, হলো আগষ্টের গণবিক্ষোভের বিদ্রোহী। 'ফাঁসি সেলে' সে রাত্রিতে সে অপেক্ষা করছে,—রাত ভোরে তার ফাঁসি। ছোট ছেলে নিলুও কংগ্রেস ও জেলের পথে চলে চলে হয়ে উঠেছে কমিউনিষ্ট ; দাদার বিরুদ্ধে পুলিশের হয়ে সাক্ষী দিতেও সে কসুর করেনি : সে রাত্রিতে সে অপেক্ষা করছে জেল গেটে, দাদার 'লাস' সে

সৎকার করবার অনুমতি পেয়েছে। ফাঁসি অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিলুর হয়নি। তা মকুব হয়। (লেখক কেন এ ব্যবস্থা করলেন? সত্যই 'আগষ্ট বিদ্রোহের দায়ে' তেমন প্রথম শ্রেণীর কোনো কংগ্রেস বা কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট কর্মীর ফাঁসি হয় নি। অন্তত এরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।) সত্যই ফাঁসি হোক বা না হোক, তাতে উপন্যাসের দিক থেকে কিছু যায় আসেনি। সবাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও জানে, ফাঁসি হচ্ছে। আর রাত্রি জাগছেন সেই ভয়ঙ্কর ধারণা বুকে নিয়ে বাবা 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে', মা 'আওরাৎ কিতায়', বিলু 'ফাঁসি সেলে', নিলু 'জেল গেটে।' 'জাগরী এই রাত-জাগার কাহিনী। প্রথমত একটি বিশেষ রাত্রির এক পরিবারের চারটি বিশেষ মানুষের কথা; তাদের চোখ দিয়ে আমরা পাই তাদের পরস্পরের পরিচয়; সহকর্মী ও সাথীদের রূপ, জেল ও জীবনের কথা। প্রধানত কিন্তু পরিচয় পাবার কথা চারটি বিশেষ টাইপের জীবন-দৃষ্টির; 'গান্ধীবাদী' পিতার, স্নেহময়ী বাঙালী মায়ের, কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট আগষ্ট বিদ্রোহীর, আর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীর। এইটিই জাগরীর প্রধান কথা—এই চরিত্র চতুষ্টয়। এঁরা ব্যক্তি-চরিত্রও যতটা ততটাই হবার কথা এক একটা বিশিষ্ট জীবনাদর্শের ও জীবনধারার টাইপ বা বর্গ-চরিত্র। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাদের আছে; এমনি কি, সে বৈশিষ্ট্যবশেই হয়ত তাঁরা বিভিন্ন আদর্শ ও পথ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু যা বারে বারে মনে হয় তা এই—এঁরা নিজ নিজ আদর্শের ও বর্গের প্রতিনিধিস্থানীয়। সে হিসাবেই পাঠক তাঁদের গ্রহণ করবেন। এবং সে হিসাবেই লেখকও তাঁদের উপস্থিত করেছেন। একই কালে তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিশিষ্টবর্গের টাইপ।

এখানে আরও বলা দরকার উপন্যাসখানার আঙ্গিক সম্বন্ধে। উপন্যাসের চার অধ্যায়ে প্রধান চারিটি চরিত্রের আমরা পরিচয় পাই স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। অবশ্য তাদের প্রত্যেককে আবার অন্যদের চোখে দেখে বুঝে নেবারও সুযোগ পাঠককে লেখক দিয়েছেন। তবু মোটের উপর এই স্বগতোক্তির 'আঙ্গিক' একটু কৃত্রিম। কারণ সেই সম্পর্কের উপর পাঠকের একটা সংশয় বরাবর থেকে যায়—বক্তা বা চরিত্র লোক-দেখানো ভালো বা মন্দ সাজছে না তো? তা ছাড়া, বক্তাই কি এরূপ উক্তিকালে সর্বাংশে অকপট হতে পারেন—নিজের কাছেও নিজে? এ ত্রুটি অবশ্য লেখকেরও জানা আছে: তাই তিনি প্রত্যেক চরিত্রকে দিয়ে এক একবার আত্মপরীক্ষাও করিয়েছেন—মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাতে চরিত্রে আরও বৈচিত্র্য এসেছে। কিন্তু তবু সম্ভবত এ আঙ্গিক গ্রহণ না করলে লেখক আরও সার্থক হতেন চরিত্র-চিত্রণে। কারণ, চিত্রণকলায় 'জাগরী'র লেখক যে দৃষ্টিশক্তি ও কুশলতার প্রমাণ দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি তা অসাধারণ। সেদিক থেকে তিনি প্রত্যেকটি

চরিত্র মারফৎ জেল ও জেলের বাইরের পৃথিবীর যে চিত্র উপস্থিত করেছেন তা যেমন সত্য, তেমনি জীবন্ত। এর পূর্বে, বাঙলা ভাষায় রাজনৈতিক জেলের এমন সত্যকারের চিত্র আর আমরা পাইনি। মনে হয়েছে এ শুধু পূর্ণিয়া জেল নয়, বাঙলারই কোনো জেল। জেলের প্রত্যেকটি মানুষ ও নিয়ম এমনি আমাদের অভিজ্ঞতায় বাস্তব।

কিন্তু লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হল চারটি স্বতন্ত্র চরিত্র, স্বতন্ত্র নীতি ও প্রকৃতিকে চারটি মানুষের স্বগতোক্তির সূত্রে রূপায়িত করে তোলা। এ দিকে তাঁর অতুলনীয় সার্থকতা গান্ধীবাদী পিতার চিত্রে। এই মানুষটির রূপ তাঁর নিজের কথায় ও তাঁর স্থির আত্মসংযত আচরণে, এবং বিলু ও নিলুর কথার মধ্য দিয়েও ফুটিয়ে তুলেছেন ; আর সে চিত্রে সম্পূর্ণতা দান করেছে মায়ের কথা—তাঁর নারী-সুলভ বাস্তব দৃষ্টি, তাঁর মাতৃপ্রাণের বেদনা ও নীরব সমালোচনা—এই সমালোচনাটুকু না থাকলে যে সেই মানুষটিকে সম্পূর্ণ আমরা পেতাম না, তাতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। বাঙলা সাহিত্য সত্যকারের এমন একটি মহৎ চিত্র এই বোধ হয় প্রথম পেল—খাঁটি গান্ধীবাদী মানুষ, শুধু মাত্র ছাঁচে-ঢালা মানুষ নয়, কোনোরূপে বিকৃত বা কৃত্রিম নয়। শেষ মুহূর্তে যেখানে তাঁর মাথা নত হয় মহাত্মাজীর উদ্দেশে সেখানে আমাদের মাথা উন্নত হয় এই আশ্চর্য মানুষকে স্মরণ করে।

এই বাবার চিত্রের পরেই স্থান মায়ের চিত্রের। বরং একদিক থেকে দেখলে মনে হয়, লেখকের প্রধান কৃতিত্ব এই মায়ের চিত্রেই। সত্যিকারের বাঙালী মা তিনি, মায়া মমতা দুর্বলতা সবই তাঁর আছে। সে তুলনায় বাবাকেও মনে হয় ফ্রেমে-আঁটা মানুষ। কারণ আদর্শবাদী মানুষ—সে গান্ধীবাদীই হোন্ আর সাম্যবাদীই হোন্,—কতকটা ফ্রেমে-বাঁধা হয়ে পড়েন, তা মিথ্যা নয়। মা সে হিসাবে আদর্শবাদী নন, শুধুই মানব-সম্পর্কের মানুষ। জীবনকে এমন সহজ স্বচ্ছ স্বাভাবিক চোখে দেখতে পান যে বাঙালী মা, জীবনের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে আসলে তিনিই হয়ে উঠেছেন এই মহানাটকের ট্রাজিডির কেন্দ্র। খুব স্বভাবতই এই বাঙালী মায়ের মুখে শুনি বাঙলার আশ্চর্য মেয়েলি বাক্যরীতি (ইডিয়ম)—লেখকের লিপি-কুশলতাও এখানে হয়ে উঠেছে অতুলনীয়। এ চিত্রে শুধু একটু অস্বাভাবিকতার ছায়া এসে গিয়েছে সেই আঙ্গিকের দোষে। কারণ, এ চিত্র সত্যকারের মায়ের বটে, কিন্তু ফাঁসি যাচ্ছে যাঁর ছেলে সে মায়ের চিত্র এ নয়। সেখানে আমরা আরও অনেক বেশি তীব্র, ঘনীভূত, হয়ত উন্মত্ত আবেগ ও স্বগতোক্তিই আশা করি—এতটা সাধারণ দুর্ভাবনা-পীড়িত বাঙালী মাকে দেখব, তা ভাবতে পারি না। অথচ ঠিক তেমনি আবেগ-তীব্র রূপে তাঁকে চিত্রিত করতে গেলে এ চিত্রেব এই অপরূপত্ব আব থাকত না। এই আঙ্গিকের দোষেই যে

চিত্রের উপর লেখকের দরদ সে চিত্রও মনে হয় যেন তত অকৃত্রিম নয়। বিলুর সমস্ত আত্মপরীক্ষা সত্বেও মনে হয় তার কথাতেও জানা-অজানায় রয়েছে একটা লোক-দেখানো ভাব, একটা "ভগবান, ইহাদের ক্ষমা করো; ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে" এই যীশু-সাজার চেষ্টা। কারণ, সত্য সত্যই বিলু তো তার বাবার মতো নয়। সে কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট; তাকে অতটা ক্ষমায় মহান্, ত্যাগে উদার করে তোলার মধ্যে একটু অসত্য রয়েছে না কি? তাই ঠিক "সি-এস-পি" টাইপ হিসাবে সে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না। কারণ, এ রাজনৈতিক দলের বেশি নিদর্শন আমরা বাঙলায় পাই না। যা পাই তাতে বিলুকে বিশ্বাস্য টাইপ মনে হয় না। কিন্তু যদি বা বিলু অমন গান্ধীবাদী পিতার পুত্র হিসাবে বিশ্বাস্য চরিত্র হয়, তা হলেও আঙ্গিকের দোষে তার চিত্রও পাঠকের মনে বরাবরই একটু সংশয় জাগিয়ে দেয়।

শেষ চিত্র নিলু। সে যে কমিউনিষ্ট টাইপ নয়, তা অন্তত আমরা নিঃসংশয়ে বুঝি। মানুষ হিসাবে পাঠকের নিকট সে পরিচিত হয়ে উঠছিল একটু দায়িত্ব জ্ঞান-হীন গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ বলে। কিন্তু তাই বলে দাদার বিরুদ্ধে পুলিশের হয়ে সে সাক্ষী দেবে, এমনও তো সে নির্বোধ, নিরঙ্কুশ বা নিঃসংশয় নয়। তবে সে তা দিচ্ছে কেন? লেখক তার সাফাই জুগিয়েছেন; "রাজনীতিক্ষেত্রে আমি নিলু, আর সে দাদা নয়"

(পৃঃ ২৭১), কারণ নিলু কমিউনিষ্ট। লেখক জানেন রাজনৈতিক তথ্য হিসাবে যুক্তিটা ঠিক নয়, ধোপে টিকবে না। তাই তিনি জানিয়েছেন, "আমার নিজের পার্টির স্থানীয়-শাখার মেম্বরদেরও মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া আমার ঠিক হয় নাই ; দাদার বিরুদ্ধে বলিয়া নয় ; তাহাদের মত যে, আমাদের কর্তব্য দেশের লোককে তাহাদের ভ্রম চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া, তাহাদের বুঝানো।" ইত্যাদি। (পৃঃ ২৯০) এটা অবশ্য "স্থানীয় কমরেডের মত" ; কিন্তু নিলু নিজে জানে তার "ভুল হয় নাই ;" (পৃঃ ২৯০)। "দাদা আমার মনোভাব ঠিক বুঝিবে ; সেখানে যে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই" (পৃঃ ২৭১)—এ সব উক্তিতে বিলু-চরিত্রের মাহাত্ম্য বাড়তে পারে, কিন্তু পাঠকের নিকট নিলু-চরিত্রের সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিশেষ করে তাকে কমিউনিষ্ট রাজনীতি বা কমিউনিষ্ট তত্ত্ব ও আচরণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে কিছুতেই প্রমাণিত করা যায় না। মাইয়োপীয়া-পীড়িত অলডাস হাক্সলি যেমন আক্রোশের বশে তাঁর প্রায় উপন্যাসেই কোনো ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গকে কমিউনিষ্ট করেন, মনে হবে, এ ক্ষেত্রে 'জাগরী'র লেখকও তেমনি একটা মনোভাবের চোরাবালিতে আটকে গেছেন—অবশ্য দেশের অনেক লোকই আজ তেমনি অবস্থায়। নানা অজুহাত দেখিয়েও লেখক সেখান থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারছেন না। নিলুর পরিণতি চোখের সামনে রেখেই যেন তিনি একটির

পর একটি তথ্য অতি নিপুণভাবে যোগ করছেন :—নিলু যন্ত্রবৎ চলে ও ভাবে, "উহার ভাবিতেও সময় লাগে না। সব বিষয়েই উহার স্থির মত আছে।" (পৃঃ ২)। সে কাব্যরসবোধহীন, দাদাকে দিয়ে লাঠিমারা গোছের সনেট (পৃঃ ৯) লিখিয়ে টাঙিয়ে রাখে। সে নিরঙ্কুশ, সূক্ষ্ম অনুভূতি থাক্, সহজ মায়া মমতারও ধার ধারে না (পৃঃ ৩৫ ও ৩৮); জেলের সহকর্মীদের নিকটও গোঁয়ার এবং একটু ইতরও, তার জন্য "লজ্জায় বিলুর মাথা কাটা যায়" (পৃঃ ৪৮—৫০)। কিন্তু সে এত দৃঢ়চিত্ত নয় যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সে দাদার মুখের দিকে সহজ স্বাধীনভাবে তাকাতে পারে (পৃঃ ৮৭)। অথচ সে বলে, "পৃথিবী শুদ্ধ লোকের ভুল হইতে পারে, আমার ভুল হয় নাই" —এম্নি বাক্‌সর্ব্বস্ব বা নিরঙ্কুশ (পৃঃ ২৯২)। শুধু তাই নয়, তার অমন সত্যনিষ্ঠ পিতা আমাদের জানান, আবাল্য নিলু কাপুরুষ; কুল চুরি করে ধরা পড়লে পরের আদেশে থুথু ফেলে "নিলু ভয়ে ভয়ে সেই থুথু খাইয়াছে—বিলু রাজী হয় নাই" (পৃঃ ১১৩); "লঘুগুরুর জ্ঞান নিলুর ছোট বেলা হইতেই কম। এ বিষয়ে বিলুর সহিত উহার আকাশ-পাতাল তফাৎ। নিলু চিরকালই একটু উদ্ধত স্বভাবের, রাগিলে উহার জ্ঞান থাকেনা।" (পৃঃ ১১৬)। পিতার "প্রাণে আঘাত দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়েনা" (পৃঃ ১৪০)। "তাহার ভাবুকতাহীন মুখ বিলুর পাশে যেন মানায় না।"

(পৃঃ ১৪০)। অথচ "বিলুই নিলুর কাপড়চোপড় পর্যন্ত কেচে দেয়।" বিলুই নিজে কলেজে না পড়েও নিলুর "কলেজের খরচ জুগাইয়াছিল।" (পৃঃ ২৪২)। নিজের ফাঁসির জন্যও তবু "নিলুকে সে (বিলু) দোষ দিবেনা। তাহাকে সে ক্ষমা করিবে। একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।" (পৃঃ ১৫০)। এই ধারার বিচার-বিশ্লেষণের চরম সেখানে যেখানে অমন মা—যিনি বিশ্বাসই করেননি নিলু তার দাদার বিরুদ্ধে কিছু করবে,—তিনিও সহজ ভাবে দুই ছেলের কথা বলতে বলতে জানিয়ে দেন, "কার সঙ্গে কার তুলনা।" এইখানে সন্দেহ হয় এসব উক্তি পিতারও নয়, মাতারও নয়, লেখকের মুখপাত্রদের। "কার সঙ্গে কার তুলনা"—কারণ লেখক বলতে চান,— একজন সি. এস, পি, আর একজন কমিউনিষ্ট! এরকম যন্ত্রচালিত, 'ভাবুকতাহীন,' নিরঙ্কুশ, নির্বোধ, বদরাগী, হামজ্ঞান্‌তারাই কমিউনিষ্ট হয়,—অলডাসের মতো superficial লেখকেরা এ বলেই খুশী হন নিজেদের চালাকিতে। 'জাগরীর' লেখকেরও শিল্পগত প্রযোজন? না এই তার মতবাদ?

পাঠকের বিচার

সাধারণ পাঠক মনে করবে—লেখকের এই হল সাক্ষ্য। পণ্ডিত জহরলালেরই কথার প্রতিধ্বনি জুগিয়েছেন তিনি উপন্যাসের এদিককার পরিকল্পনায়—কমিউনিষ্টরা ছিল

১৯৪২ এর "আগষ্ট বিপ্লবে" "অন্যদের পক্ষে"। অথচ লেখক অতটা নিরঙ্কুশ নন; তিনি জানেন কথাটা নিরঙ্কুশ সত্য নয়। তাই নিলুর নিজের জবানীতে এই রাজনৈতিক মিথ্যা প্রচারকে তিনি অনেকটা নিরসন করেছেন। জানিয়েছেন, পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বররা অন্ততঃ নিলুর আচরণ সমর্থন করেনা। অবশ্য সংশয় থাকবে "স্থানীয় সভ্যরা" না করুক, উর্দ্ধতন সভ্যরা করতো; যেহেতু নিলু জানে তার ভুল হয়নি, অন্তত এই ছিল কমিউনিস্ট নীতি-সম্মত আচরণ। লেখক এরূপে নিজেকে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—আর সেদিকে তাঁর প্রধান নজির হল নিলুর স্বগতোক্তি। তার মধ্য দিয়ে যে মানুষটাকে তিনি উপস্থিত করেছেন মোটেই সে ভীরু, ভাবনাহীন খামখেয়ালী নিরঙ্কুশ নিরেট মানুষ নয়। যাকে সকলের মুখ দিয়ে তিনি পরিচিত করেছিলেন অমন ভাবে, পাঠক দেখলেন, লেখক তারও প্রতি সুবিচার করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাতে নিলু-চরিত্রের অসঙ্গতি ও তার আচরণ আরও দুর্বোধ্য হয়ে রইল।

অথচ সত্যই কি লেখক তাঁর নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন? ছোট্ট একটু প্রমাণ দিচ্ছি। যে বিলু মৃত্যুর কাছাকাছি এসে বলছে, বাঁচলে সে এ দেশকে গড়তে চেষ্টা করতো সোবিয়েত দেশের আদর্শে; গ্রন্থারম্ভে (পৃঃ ৫)

জেলখানার কথা বলতে গিয়ে সে বলছে, জেলখানা যেন একটা লোহার শহর। তারপর সে সূত্রে সেই বিলুরই মুখে লেখক বসিয়ে দিলেন একটি ছোট্ট মন্তব্য; "এই শহরের নাম লৌহগরাদ হইলে বেশ হয়; লেনিনগ্রাদের মত শুনিতে লাগে।" লেখক সত্যই এখানে লেনিনগ্রাদের নামটিকে বিদ্রূপের বস্তু করে তুলতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিদ্রূপ বিলুর মুখে স্বাভাবিক হলে সে-বিলু মৃত্যুর নিকটে এসে ভারতবর্ষকে সোবিয়েতের মত করে গড়বার কথা না বলে বলতো "ম্যানেজেরিয়াল রিভল্যুশন" বা আমলাচক্রের আওতায় দেশ-গঠনের কথা। বিদ্রূপ হিসাবে অবশ্য কথাটি উপভোগ্য। কিন্তু কথাটার নিগূঢ় শ্লেষ (irony) আরও গুরুতর—সত্যই সেই ১৯৪৩ সনের মে মাসে লেনিনগ্রাদ লৌহ-গরাদই। হিটলারী ফৌজের বোমা-বিমানে সেখানকার নরনারী তখন অনাহারে অস্ত্রাঘাতে মরবার প্রতীক্ষা করছে—আর করছে বাঁচবার সাধনা। নিতান্ত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি বিরোধে এদিকে অন্ধ না হলে তখন তা বিলুই বা ভুলবে কেন? আসলে মানতেই হবে, এখানে বিলু প্রকাশিত হয়নি। এখানে লেখকই আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। তখন পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয়না—কেন লেখকের হাতে নিলুই হবে পুলিশের সাক্ষী।

লেখকের সাক্ষ্য

কিন্তু পাঠকের এই সহজ বিচারও লেখকের প্রতি একেবারে সুবিচার নয়, একথা কমিউনিষ্ট নীতি ও কমিউনিষ্ট কর্মীদের জানলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি। আমরা আমাদের চোখ দিয়ে নিলুকে দেখছি আর বুঝছি সে আর যাই হোক কমিউনিষ্ট নয়। আসলে সে ইনডিভিডুয়ালিষ্ট, এনার্কিষ্ট, এন্টি-সোস্যাল; তাই সে সকলকে আঘাত দিতে পারে আর ভাবতে পারে "আমি কিছুতেই ভুল করি নাই।" কিন্তু কথা এই, মূলতঃ তো নিলু স্বার্থপর, আত্মসর্বস্বও নয়, কেন সে তবে হয়ে উঠল এমন আত্মতন্ত্রী? লেখক তা স্পষ্ট করে নির্দেশ করেননি। কিন্তু অন্যদের স্বগতোক্তি আর নিলুর স্বগতোক্তি মিলিয়ে পড়লে তার উত্তর আমরা পাই। যে পিতার কাছে, মাতার কাছে, ভ্রাতার কাছে কেবলই স্নেহ ও সুবিধা পেল, কিন্তু মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেলনা, তার মনে বিকৃতি জমে উঠবেই। এখানেই নিলুর জীবনের ট্রাজিডি। এটা তার আত্মবিদ্রোহ ও আত্মনিগ্রহ। আত্মছলনা বা আত্মতৃপ্তির থেকে তা বিশেষ খারাপ নয়, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা এ্যান্টিসোস্যাল। অবশ্য নিলুর মনের এই বিকাশের বা বিকৃতির কথা লেখক কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি, তাই নিলুর এই রহস্য সহজে চোখে পড়েনা। সহজে চোখে পড়ে তাকে কমিউনিষ্টের বিকৃত

টাইপ হিসাবে। এজন্য আসলে লেখক যতটা দায়ী, তারও চেয়ে বেশী দায়ী বর্তমানের কমিউনিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ।

কমিউনিষ্টদের পক্ষে তাই আশ্চর্য না হলেও চলবে যখন তারা দেখবে, 'জাগরী' আর তার নিলুর চরিত্র আজকের দিনে তাদের বিপক্ষে কাজ দিচ্ছে, লেখকের যা'ই থাক উদ্দেশ্য। এবং কমিউনিষ্টদের মনে রাখা দরকার তাদের নীতি যা 'জাগরী'র পিতার মুখেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "গণমতের উপর যে পার্টি নির্ভর করে তাহার তো একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত জনতাকে অন্যদলের ভুলের কথা বুঝানো আর বুঝাইয়া ভ্রান্তপথে চালিত জনমতকে নিজের দিকে করা।" এইটিই যথার্থ কমিউনিষ্ট নীতি। জনতার থেকে বিচ্ছিন্নতা জনতার পার্টির পক্ষে অসম্ভব। বড়দের "সুবিধাবাদিতার" কাছে লুটিয়ে পড়লে পার্টির "সুবিধা হয় বটে, কিন্তু জনতার প্রতি করা হয় বিশ্বাসঘাতকতা।" A policy of principle is the only correct policy।" অবশ্য পথটা বেশ মসৃণ নয়। কিন্তু পুলিশের হাতে মার খাবনা, 'ভদ্রলোকের' হাতে মার খাবনা, এমন কমিউনিজম্ই বা কোন্ দেশে কোন্ কালে চলে?

রাজনৈতিক উপন্যাসের সত্য

অনেক আশা নিয়ে আমরা অভিনন্দন করছি "জাগরী'র লেখককে; কারণ আমরা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভবিষ্যতে

বিশ্বাসী। এ দিকে "জাগরী" এক সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর। জেলখানা আর জেলখানার রাজনৈতিক ওয়ার্ডের দেখা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মানুষদের এমন চমৎকার চিত্র আর বাঙলা সাহিত্যে কেউ আঁকেন নি, একথা আগেই বলেছি। তার থেকে সত্য কথা,—কংগ্রেস জীবনের একটি সার্থক চিত্র আমরা বাঙলা কথা-সাহিত্যে পেলাম, পেলাম সার্থক কয়েকটি রাজনৈতিক টাইপ ও মানুষ। কিন্তু এ সার্থকতার কারণ যা তা এ সূত্রে আমাদের স্মরণীয়—'জাগরী'র ছত্রে ছত্রে বোঝা যায় তা এই লেখকের অকৃত্রিম প্রেরণা, তাঁর আন্তরিকতা। তাঁর সংবেদনশীল মন, তাঁর বাস্তব দৃষ্টি, তাঁর চমৎকার লিপিকুশলতা—এর কোনোটি তুচ্ছ নয়, কিন্তু এ দিক থেকে আরও সত্য তাঁর এই অকৃত্রিমতা।

কথাটা বুঝবার মতো। কোনো কোনো শক্তিমান লেখক ইতিপূর্বে রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন। জেল বা কংগ্রেস আন্দোলন তাঁদেরও প্রেরণা জুগিয়েছে। কেউ কেউ সে উপ-লক্ষেই কমিউনিষ্টদেরও যেমন খুশী চিত্রিত করে খুশী হয়েছেন। তাঁদের সমর্থকদেরও খুশী করেছেন। কিন্তু তাঁদের কারো হাতেই রাজনৈতিক উপন্যাস এ জাতীয় সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ—তাঁদের কারও নিকট রাজনীতি এত সত্য নয়, তাঁদের কারও রাজনৈতিক জীবনে এমন আস্থা নেই, তাঁদের কারো লেখায় এমন আন্তরিকতার স্বাক্ষর নেই। 'জাগরী'র লেখক তাই উদ্দেশ দিচ্ছেন একটি বৃহৎ সত্যের। অনুরূপ

উপন্যাস রচনায় হয়ত ফাঁকি চলতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাসের জন্য অন্তত দুটি জিনিস চাই—রাজনৈতিক আন্তরিকতা আর সামাজিক সত্যনিষ্ঠা।

কিন্তু এই সূত্রেই বলা দরকার রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'জাগরী'র অসম্পূর্ণতা কোথায়। এ গ্রন্থের পটভূমিকায় রাজনৈতিক অবস্থা আছে বটে; কিন্তু সত্যই রাজনীতি তার আসল উপকরণ নয়। বিলু ও নিলুর সম্পর্কও রাজনীতির সম্পর্ক নয়—অন্তত, লেখক তা সেভাবে উপস্থিত করেন নি। এই রাষ্ট্রীয় পরিবারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজনীতিকে মেনে নেয়; এখানে রাজনীতি সেই খড়্গ নয় যা মানুষকে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে—যেমন বিচ্ছিন্ন করে সত্যের সাধনা। পিতা, মাতা, পুত্রদের কারও নিকট রাজনীতি তেমন মর্মচ্ছেদী সত্য রূপে, সাধনা রূপে গৃহীত হয়নি।

জীবনের পরিচয়

'জাগরী'র লেখককে তবু অভিনন্দন জানাতে হবে অকুণ্ঠ চিত্তে, কারণ রাজনৈতিক উপন্যাসের মূল তিনি পরিষ্কার করে নির্দেশ করেছেন—সে হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। উপন্যাস শুধু জীবন্ত কালের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে, তা নয়। এ উপন্যাসে জীবনের বাণীও রূপ নিয়ে উঠেছে। সে বাণী মানুষ—মানব-সত্য। সেই বাণীকে যে সাধারণ পাঠক দেখবেন শুধু রাজনৈতিক

জেহাদের ঘোষণাপত্র বলে তিনিও সত্য বিস্মৃত হবেন ; যিনি শুধু 'কংগ্রেসী' জীবনচিত্র বলে গণ্য করবেন তিনিও সম্পূর্ণ মর্যাদা দেবেন না। কারণ, আরও একটি বৃহত্তর চেতনা এ উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠতে চেয়েছে,—জীবন-সত্যের সঙ্গে লেখকের মুখোমুখি পরিচয় করার আকুল প্রয়াস। সেই প্রয়াসের বশেই তিনি জীবনের চারটি স্বাক্ষরের কোনোটিকে অগ্রাহ্য করতে চান নি ; বিলু, বাবা, মা, নিলু কারো মধ্যে নিজেকে মিলিয়েও নিঃশেষ হতে চান নি ; প্রত্যেককেই উপস্থিত করেছেন জীবন-চক্রের এক একটি কোণের সাক্ষীরূপে, প্রত্যেককেই দিতে চেয়েছেন সমান মর্যাদা। আর নিজের মতামতের শত তাগিদ সত্বেও তাদের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেছেন তার অন্তরের এক গভীরতর উপলব্ধি—"জীবন এমনি পরমাশ্চর্য সত্য।"

এই মহৎ সত্যের উপলব্ধি নিয়ে যে লেখক সাহিত্যে প্রবেশ করলেন, নিশ্চয়ই মহৎ তাঁর সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি সেই সূত্রে "রাজনৈতিক উপন্যাসের" সীমাকেও প্রসারিত করেছেন। আর উপন্যাস হিসাবে তার যে সত্য মানতে হবে, তা পরিষ্কার করে তুলেছেন। তাই এই রাজনৈতিক উপন্যাস শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নয়—বাস্তবের বিচার মাত্র নয় ;—সে কাজ প্রধানত বিজ্ঞানের। অবশ্য এ বিশ্লেষণ দৃষ্টি একেবারে না থাকলে রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকেরও চলেনা। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর দেখা চাই মানুষকে, 'চরিত্রকে', জীবন-সত্যকে—রাজনীতি যাকে আরও সত্য করে তোলে—অথবা মিথ্যা করে দিতে চায়।

মানুষের মধ্য দিয়ে এই রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা—কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করা জীবনের গতি-সাক্ষ্য হিসাবে,—এই হল রাজনৈতিক উপন্যাসের দুশ্চর ধর্ম।

ইং ১৯৪৬

আধুনিক বাঙলা ছোটগল্প

ভাগ্যক্রমে আধুনিক বাঙলা ছোটগল্প পড়বার সম্প্রতি সুযোগ মিলে। সুযোগটা মিলছে প্রধানত প্রকাশকদের জন্য। একালের বহু লেখকের 'শ্রেষ্ঠগল্পের' একাধিক সংকলন বৈষয়িক উদ্যোগ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। দু-চার বৎসর আগেকার প্রতি বৎসরের 'সেরাগল্প' প্রকাশেরও ব্যবস্থা কেউ কেউ করেছেন। '১৩৫৪এর সেরাগল্প' পর্যন্তই (শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছে; তার পরবর্তী সময়কার গল্প এখনো সংকলিত হয় নি। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে গত কয় বৎসরের এরূপ কবিতা সংকলন বা প্রবন্ধ সংকলনেরই বা আয়োজন কোথায়? আর এরূপ সংকলন না থাকলে পুরনো মাসিক পত্রের ধুলো ঝেড়ে কার সাধ্য উদ্ধার করবে সম্প্রতিকার বাঙলা কবিতা বা বাঙলা প্রবন্ধ? অথচ একথাও শুনেছি—বৈষয়িক চেষ্টা হিসাবে প্রবন্ধ-গ্রন্থ যদি বা চলে, কবিতা-গ্রন্থ ও গল্প-গ্রন্থ নাকি বড়ই অচল। বর্তমান প্রকাশকদের প্রয়াস দেখে মনে হয়—হয়ত 'শ্রেষ্ঠগল্প' ও 'সেরাগল্পের' ভাগ্য তত অন্ধকার নয়।

এক সঙ্গে এতগুলি গল্প সংকলন পড়ে বুঝতে সুবিধা হয় বাঙলায় উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বেশ আছে। বর্তমান সময়েও

তা কম লেখা হচ্ছে না। অবশ্য সব 'শ্রেষ্ঠগল্প' শ্রেষ্ঠ নয়, আর সব 'সেরা গল্পও' সেরা নয়। কিন্তু এ কথা মেনে নিয়ে বলা যায়, এ সব গল্প-সংকলন থেকে আমরা মোটের ওপর আধুনিক বাঙলা ছোটগল্পের অবস্থা বুঝতে পারি। হয়ত আরও অনেক জিনিসও বুঝতে পারি—বাঙলা সাহিত্যেরও একটা আভাস পাই, বাঙালী জীবনেরও একটা ঠিকানা কিছু না কিছু পাই। তা না হলে ছোটগল্পকে সাহিত্য বলে আমি অন্তত গণ্য করব না, মনে করব তা অবসর বিনোদনের জিনিস। যেমন, তাস খেলা, কিংবা ম্যাজিক দেখা। কিংবা তার থেকে খুব বেশি ভালো হলে দেখা—একদিনকার ফুটবল খেলা। নিশ্চয়ই জীবনে ওসব ক্রীড়া-কৌতুকের স্থান আছে, কিন্তু সে স্থানটা সাহিত্যের তুলনায় ছোট। তার উদ্দেশ্য বিশ্রাম দান নয়, বিশেষ সৃষ্টির প্রেরণা দান করে। যে ছোটগল্পের স্থান তেমন 'ছোট' তা বিলিতী সাময়িক পত্রের পাতায় অজস্র পাওয়া যায়। আমাদের সাময়িক পত্রেও তার নকল বা নিজস্ব অনুকরণ যথেষ্ট থাকবার কথা। কারণ, এ কালের সাময়িক পত্রের পক্ষে এরূপ গল্প একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। ব্যস্ত পাঠক কাজের পথে যেতে যেতে দু'দশ মিনিট যাতে সময় কাটাতে পারেন, আর তারও মধ্যে পেতে পারেন একটু বিশ্রাম-সরসতা, তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্যটা আরও একটু বৃহৎ এবং মহৎ। যে ছোটগল্পে তা নেই—তা সত্যই 'ছোট', আর তা আমার আলোচ্য নয়।

ছোট গল্প কাকে বলে ? স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরীর সেই সংজ্ঞা —'যে গল্প ছোটও হবে, গল্পও হবে'—এ সংজ্ঞাই যথেষ্ট কিনা, সে বিচার করাও এখানে আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিমের বহু লেখকের বহু ধরণের ছোটগল্প আমরা পড়েছি। ছোটগল্পের এক রাজা ফরাসী মোপাসাঁ, অন্য দিক্‌পাল রুশ চেখভ্, তৃতীয় মহাজ্যোতিষ্ক বাঙলার রবীন্দ্রনাথ। সব লেখকের নিজস্বতা থাকে, কিন্তু এঁরা ছোটগল্পের ত্রিলোক আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া মার্কিন পথকৃৎ পো থেকে হেমিংগোয়ে, কিংবা ইংরেজি ছোটগল্পের শিল্পী ক্যাথেরিন্ ম্যান্‌স্‌ফিল্ড বা সমরসেট মম্ প্রভৃতিদের অজস্র গল্প রয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে 'সাকি', ও' হেনরির মত চতুর লেখকদের সাময়িক গল্প ; আর খুন-দস্যুতা, ভুতুড়ে, ভয়-ভীতি নিয়ে রচিত অজস্র ত্রাস ও রহস্যোদ্দীপক গল্প। আমাদের নিজেদের সাহিত্যে রবীন্দ্র-নাথকে ছেড়ে দিলেও প্রভাতকুমার থেকে তারাশঙ্কর, 'বনফুল' পর্যন্ত বহু লেখকের গল্প রয়েছে। অতিকায় পত্রগুলির শারদীয় আয়োজনও প্রতি বৎসরই ক্রমবর্ধমান। এ সব থেকে আমরা মোটামুটি ছোটগল্প কাকে বলে তা বুঝি,—সংজ্ঞা ও স্থির করতে পারি, কিন্তু তা নিয়ে গবেষণা নাই বা করলাম। এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙলা ছোটগল্পের যে পরিচয় পাই তাতে দু'টি কথা আমরা বুঝতে পারি—সাহিত্য হিসাবে বাঙলা ছোটগল্প মোটামুটি গৌরব দাবী করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে বিস্মৃত না হয়েও বলতে পারি এ কালের শ্রেষ্ঠগল্পের লেখকরাও সত্যই

সার্থক। দ্বিতীয় কথাটি এই—বাঙলার ছোটগল্প স্রষ্টাদের মধ্যেও নূতন বিষয়-বস্তু আসছে, কিন্তু তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নিতে এখনো পারছেন না।

জীবন-পরিচয়

এই দ্বিতীয় কথাটি থেকেই আলোচনার সূচনা করা হচ্ছে। কিন্তু কথাটির সূচনা জীবন্ত লেখকদের 'শ্রেষ্ঠগল্প' সংগ্রহ ও '১৩৫৪-র সেরাগল্প' থেকে। 'সেরা গল্প'সংগ্রহে মোট ১৩টি গল্প আছে—সব কয়টি গল্পই ১৩৫৪-র সেরা না হোক পাঠকদের অল্পাধিক পরিচিত। অবশ্য এ সংগ্রহে তারাশঙ্করের গল্প নেই, মাণিকবাবুর গল্প নেই, আশালতা দেবী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের গল্পই নেই। তবু পাঠক এই সেরাগল্পের সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের একটা আংশিক পরিচয় পান, আর পান ১৩৫৪'র বাঙালী জীবনেরও একটা পরিচয়। কোনো কোনো গল্পে এ দু' পরিচয়ই পরিচ্ছন্ন। কোনো কোনো গল্পে লেখক আঙ্গিক ও রূপ-রচনাকে মুখ্য করে সামাজিক সত্যকে করেছেন গৌণ,—যেমন, অচিন্ত্যকুমারের 'মুচি-বায়েন'। তথাপি চির-কালের সাহিত্যকর্মের দিক থেকে লিখিত হয়েছে মাত্র দু'তিনটি গল্প—যাকে বলা যায় তথাকথিত ভাবে 'সমাজ-নিরপেক্ষ'—এবং নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক 'শিল্প'। অর্থাৎ জীবনের গতিময়তা অপেক্ষা জীবনের চিরন্তনতারই চেতনা যার উপাদান; প্রগতি অপেক্ষা

তা'ই status quo ও স্থাণুত্বের স্বপক্ষে যার প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটি এ ধরণের ; 'বনফুলের' গল্পটি নিছক আকাশলতা। অন্তত একটি গল্প আছে যাতে এই স্থাণুত্বের জয়গান সুস্পষ্ট—এবং প্রকাশ-চাতুর্যে সার্থক। সেটি হচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলির 'চাচা কাহিনী'। আসলে সেটি হিট্‌লারি 'ব্লাড থিওরির' তথা 'গীতা'-পরিশুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে একটি সার্থক রচনা। মুজতবা আলি সাহেব স্বয়ং 'সৈয়দ' বলে—সামাজিক কারণেই—আরও মারাত্মক এই সাহিত্যিক কুশলতা। এ গল্পের স্পষ্ট ফলশ্রুতি 'ব্লাড-থিওরি' মার্কা-প্রতিক্রিয়াশীলতা। অন্য দিকে নবেন্দু ঘোষের 'ছিন্নমস্তা', নারায়ণ গাঙ্গুলীর 'টোপ', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঘুষ', পরিমল গোস্বামীর 'গুহ এণ্ড পাল', রমেশ সেনের 'সাদা ঘোড়া', গল্পগুলির ফলশ্রুতি—প্রগতি ; মনোজ বসুর '১৫ই আগষ্ট,' গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'অন্নপাপ', গল্প দুইটিরও প্রচ্ছন্ন ফলশ্রুতি তা'। আর সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বন্যা' গল্পটিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও সৃষ্টিশক্তির প্রমাণ—বন্যার প্রেক্ষাপটে বিহারের একটি গ্রামে নানা শ্রেণীর সুনিপুণ চিত্র। কিন্তু একটু ছক্‌কাটা প্রণালীতে আঁকা, schematic ধরণের। এই গল্প সংগ্রহ থেকে বুঝতে পারি মোটের উপর বাঙালী সমাজে ১৩৫৪ সালে কি জীবন-সমস্যা প্রধান হয়েছিল। ১৩৫৪ সাল স্বাধীনতার প্রথম বৎসর (যে স্বাধীনতার স্বরূপ মনোজ বসু '১৫ই আগষ্টে' শিল্পী-সুলভ সাবধানতার সঙ্গে দিয়েছেন), চোরা বাজারেরও সুবৎসর

(গজেন্দ্রবাবুর গল্পে আর পরিমলবাবুর গল্পে তা প্রত্যক্ষ) ; জমি-বেচার বৎসর (প্রমাণ, 'ছিন্নমস্তা') হিন্দু-মুসলমান জেহাদের বৎসর (প্রমাণ, 'সাদা ঘোড়া')—আর হিন্দুসভা মার্কা 'ব্লাড থিওরি'রও বৎসর (তার প্রতিফলন 'চাচা কাহিনী')।

সম্পাদক বা লেখকগণ যতই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বা বিশুদ্ধ ভাববাদী হোন তাঁরাও কালকে অস্বীকার করতে পারেন নি, সাহিত্যিকরাও পারেন নি অস্বীকার করতে সমসাময়িক সমাজ-সত্যকে—'১৩৫৪র সেরা গল্পে'র থেকে সাহিত্যের বাস্তবমুখিতার এ প্রমাণ আমরা পাই।

অবশ্য পূর্বেই বলেছি, এ সংগ্রহে যে কোনো কারণেই হোক্ ঠাঁই পান নি—এমন 'সেরা গল্প' রচয়িতা আরও আছেন, বিশেষ করে আছেন তাঁরা যাঁরা "প্রগতি সাহিত্যিক" বলে সুপরিচিত বা সাহিত্যে বাস্তববাদ চান। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক ও সমরেশ বসু, অন্তত এ কয়জনার কোনো না কোনো ছোটগল্প এ সব 'সেরা গল্পের' সমতুল্য ছিল। নরেন্দ্র মিত্রের নিজর একটি স্থান আছে। সম্পাদকের তা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, তা স্বাকার্য। কারণ নবেন্দুবাবু, নারায়ণ-বাবুদের মত প্রগতিবাদীদের গল্প ত তিনি গ্রহণ করেছেন ; কাজেই সম্পাদকের ত্রুটি না খুঁজে আমরা বাঙলার 'শ্রেষ্ঠগল্প' ও 'সেরাগল্প গুলির' মানদণ্ডে নূতন বাঙলা গল্পের ত্রুটি সম্বন্ধেই সচেতন হতে চেষ্টা করি না কেন ? বলা নিষ্প্রয়োজন ছোটগল্পে আমাদের শক্তি পরীক্ষিত বলেই তার ত্রুটি অনুসন্ধেয়।

যে কয়টি সমাজ দৃষ্টিসম্পন্ন গল্প এ সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে তার প্রত্যেকটিই বিচারে সমুত্তীর্ণ। তবু যদি বলি তার অনেকগুলিই ত্রুটিমুক্ত নয়, তা হলে আশা করি লেখকেরা ভুল বুঝবেন না। প্রথমত, নবেন্দুবাবুর গল্পটি শক্তিশালী হলেও তা গঠনে-ত্রুটপূর্ণ। নারায়ণবাবুর গল্পটিও তাঁর সেরা গল্প বলে গণ্য হবে কিনা সন্দেহ। যে বিষয়টির উপর 'টোপের' মূল ভিত্তি তা বড়ই অবিশ্বাস্য। কাজেই যে চমৎকার পরিবেশ নারায়ণবাবু গল্পটিতে রচনা করেছেন—তাতে রাজাবাহাদুরদের মত হিংস্রপশুদের প্রতি যে সুস্থ, স্বাভাবিক বিরোধিতা পাঠকের জন্মে,--তাও চমক খেয়ে ভেঙ্গে যায় সেইখানে এসে। পাঠকের সংশয় বাধে—এ অসম্ভব, লেখক জোর করে জমিদার-রাজাদের অ-মানবিক করে আঁকছেন। তার রাজাবাহাদুরদের মানবমূল্য অস্বীকৃতিও পাঠকের মনের এই ফাঁক দিয়ে তখন পরিত্রাণ পায়। গল্পটির ত্রুটি রূপকলায় নয়, মূলগত সত্যেও নয়, সত্যের যথার্থ বাহক নির্বাচনে; মানুষকে বাঘের টোপ করা বাড়াবাড়ি। রমেশ সেন ও পরিমল গোস্বামী দুজনারই গল্প দুটি আরও আঙ্গিকে শ্রীসম্পন্ন হলে চমৎকার হত। কারণ দুজনারই পাকা হাত। বিশেষ করে পরিমল গোস্বামী স্বচ্ছ ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত। এই গঠনকলার দিক থেকে সার্থক অচিন্ত্যকুমার এবং সৈয়দ মুজতবা আলি, বিভূতিভূষণ ও বনফুল এবং নূতন লেখকদের মধ্যে নরেন্দ্র মিত্র। নানা লেখকের শ্রেষ্ঠগল্প পড়তে পড়তেও এই কথাই মনে হয়—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল

জানা ছাড়া সাধারণত যাঁরা নূতন সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা ছোটগল্পের অঙ্গিকে ও শিল্পকলায় অমনোযোগী। বিষয়বস্তুই তাদের কাছে এত মুখ্য হয়ে ওঠে যে, কি ভাবে তা বলা শিল্প-সম্মত—আর শিল্প-সম্মত বলাই সার্থক বলা—তা নূতন ভাবের ঠেলাঠেলিতে তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না, ভাবতে যেন চানও না। এ ছাড়া অনেক কাঁচা লেখক বাঙলা ভাষাও লিখতে জানেন না; তাঁরা আমাদের আলোচ্য নন; কারণ তাঁরা লেখক বলেও গণ্য হবেন না।

বস্তু ও রূপ

এবার ভাব আর রূপ নিয়ে তর্ক উঠবে। অথবা, উঠবে আধুনিক জীবন-সাহিত্যের পরিভাষায় 'content' ও 'form'এর তর্ক—বিষয়বস্তু আর রূপায়ণ নিয়ে তর্ক। এ তর্ক যে অনেকাংশে নিরর্থক, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, সৃষ্টি যে জিনিস তাতে এ দুই জিনিসে মিলে-মিশে অচ্ছেদ্য হয়ে যায়, তাই ত তা সৃষ্টি। বিশ্লেষণের প্রয়োজনেই শুধু আমরা বিষয়বস্তু ও রূপায়ণকে আলোচনাকালে পৃথক করে ধরে নিই;—সৃষ্টিক্ষেত্রে তা অবিচ্ছিন্ন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই বিশ্লেষণের দিক থেকে আমরা জীবন-নিষ্ঠ হলে বলব—কন্‌টেন্‌টই প্রথম ও প্রধান, ফর্‌ম্ তার সহযোগী ও অনুগামী। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্ষেত্রের কথাটা কেউ যদি সৃষ্টিকালেও ধরে বসে থাকেন তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্ম ও সৃষ্টিধর্মের মর্মকথাই বিস্মৃত হবেন। সত্য

সত্যই সৃষ্টি ত রূপহীন নয়, এমনকি সাহিত্যের ভাববস্তুও একটা নির্গুণ্ পরমব্রহ্ম নয়। অন্তত সেরূপ তত্ত্বের মূল্য শিল্পে, সাহিত্যে নেই—আছে বিজ্ঞানে, দর্শনে। শিল্প-সাহিত্য রূপ নিয়েই কারবার করে—যে রূপও ভাব-ছাড়া হতে পারে না। অতএব, ক্রোচের মত ভাববাদী গোঁড়ামির বশীভূত না হয়ে বা একালের রূপকলাবাদী বা 'formalist'দের মত গোঁড়ামির মধ্যে তলিয়ে না গিয়েও বলতে পারি যে, রূপায়ণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যিকের পরীক্ষা। রূপ তো শুধু একটা form নিয়ে জালবোনা নয়, টেকনিক্ বা আঙ্গিক মাত্র ত নয়।—সেরূপ ফাঁকি অনেক আছে; সাহিত্যে বড় বড় শ্রেষ্ঠগল্প লেখকেরা এই ফাঁকি দিয়ে অহরহ বাজিমাৎ করছেন তাও ঠিক।—কিন্তু সত্য সত্যই রূপ ভাবের দেহ; আর দেহ ছাড়া প্রাণ নেই।

ছোটগল্পে এই রূপায়ণের কথাটা যথার্থ ভাবে বিবেচনা করলে কি দাঁড়ায়? লেখকের মনে প্রথম একটি বিশেষ ভাববস্তু উদিত হয়েছে। ছোটগল্পের আত্মা একটি-মাত্র ভাববস্তু—তা একটি ঘটনা হোক্ বা একটি চরিত্র হোক্, একটি বিশেষ অনুভূতি বা mood হোক্, কিম্বা হোক্ আর যা হতে পারে। তবে একাধিকের স্থান খাঁটি ছোটগল্পে নেই। সে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাব-বস্তুটিকে সমস্ত খোলস ছাড়িয়ে আপন নিজস্ব দেহটির মধ্যে মূর্ত করতে পারাই হল ছোটগল্পের লেখকের কাজ। কোনো বেশি কথা থাকবে না, ভাবের প্রয়োজনে যতটুকু কথাবস্তু চাই ঠিক ততটুকু ঘনায়িত দৃঢ়নিবদ্ধ কথাবস্তু থাকবে। অবশ্য, কেউ

কেউ এ পরিণতিতে ও'হেনরি-সুলভ একটি চমক বা 'twist' দেয়—এমনিতর 'প্যাঁচ' বাঙলায় 'বনফুলের'ও করায়ত্ত। কিন্তু আসলে কথাবস্তু আপনা থেকেই আপনার প্রকাশ-কলা, বা টেক্‌নিক্ স্থির করে নেয়, টেক্‌নিকের জন্য স্রষ্টাকে হাতড়াতে হয় না, কথার উপরে তা চাপাতে হয় না। 'চমক' জিনিসটা এমনি একটা stunt বা trick হয়ে উঠেছে—তা কথাবস্তুর নিজ পরিণতি না হয়ে লেখকের চাপানো বক্রগতি।

সাধারণত formকে গৌণ ও অনুগামী মনে করে বস্তুবাদী লেখকেরা ঠিক করেন। কিন্তু content-কে তার নিজস্ব রূপে ধরতে না পেরে তাঁরা ছক কেটে ধরেন, বা এলোমেলো করে ফেলেন। সময় বিশেষে তবু যে এমন লেখা টিকে থাকে তার কারণ তার বস্তু-সম্পদ, প্রাণ-সম্পদ। রুগ্ন বা বিরূপ দেহও যেমন প্রাণ-সম্পদে আদরণীয়, কিন্তু মৃতদেহ আদরণীয় নয়,—এও তাই। আবার দেহহীন প্রাণও অনাবিষ্কৃত।

অবশ্য এমন প্রগতিবাদী লেখকও আছেন যাঁরা রূপায়ণকেই সর্বস্ব বলে মনে করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কবিতাতেই সাধারণত তেমন formalism বা রূপায়ণবাদ দেখা যায়। ছোটগল্পে অন্তত বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে রূপায়ণের প্রতি অন্যায় সন্দেহই আমরা বেশি দেখি।

কিন্তু রূপায়ণ সম্বন্ধে এই লেখকদের এত অমনোযোগ কেন? একি গল্প লেখকদের বস্তুনিষ্ঠার বা content নিষ্ঠার পরিচায়ক?

অবান্তর বস্তুবাদ

যে লেখক সত্যই content ও form এর পার্বতী-পরমেশ্বর রূপ দেখতে পান তিনি নিশ্চয়ই এরূপ কথা বলবেন না। বরং এই রূপায়ণ-বিরোধিতা অনেক সময়েই উল্টো জিনিসের প্রমাণ —বস্তুসম্বন্ধে ভাববাদী আতিশয্যের, বস্তুনিষ্ঠার নয়। 'বস্তু নিয়ে ভাব বাদ' কেমন? কথাটা কি অপাতবিরোধী শোনায়? হাঁ, কিন্তু আসলে কথাটা স্ববিরোধী নয়। সৃষ্টিক্ষেত্রে বস্তুকে লেখকের চিন্‌তে হয় স্রষ্টারূপে। বৈজ্ঞানিকের মত বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দিয়ে শুধু সূত্র চিন্‌লেই হয় না, যথা জমিদার বা মহাজন বা পুঁজিদার হচ্ছে চতুর, খল, লোভী। সেই জমিদার বা পুঁজিদারকে চিনতে হয়—প্রথমত, যেখানে সে মানব-সম্পর্কের মধ্যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে হাজার আপাত-বিরোধী চিন্তায় অনুভূতিতে মানুষ সেখানে। দ্বিতীয়ত, তা সত্ত্বেও আবার সে শুধু মানুষ নয়—জমিদার, মহাজন, পুঁজিদার একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। তা ছাড়া, হাজার সম্পর্কের মধ্যেও যেটি যার বিশিষ্ট ব্যক্তি-রূপ সেটি বুঝা চাই। অথচ সমস্ত গতিময় জীবন-যাত্রার মধ্যে তার জীবনের অর্থ, তার বিশেষ স্থান যা রাখতে হয় চোখের সম্মুখে—মানুষের এই 'টাইপ' বা বর্গরূপ ও ব্যক্তি-রূপ দুইই প্রত্যক্ষ করতে হয়,—এই হল সাহিত্যিকের সাধনা। কিন্তু ঘটনার সাক্ষ্য পুঞ্জীভূত করতে গিয়ে লেখক এ মানুষকে ভুলে যেতে পারেন—ছোটগল্পের আকারে লিখতে বসেন রিপোর্টাজ (এদেশে যে বিশেষ সাহিত্য-শাখার সৃষ্টি প্রগতিসাহিত্যিকরা

করেছেন, তা স্বীকার্য)—এটি হচ্ছে সাধারণ ত্রুটি। কিম্বা ঐতিহাসিক লক্ষ্য-বেধের উৎসাহে আবার মানবীয় রূপটাকে একটা বাঁধা-ধরা ছাঁচে ঢেলে দিতে পারি—এই ত্রুটিই সাধারণ লেখকের অধিক,—যেন গল্পটা একটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ—যার শেষে Q. E. D. লিখতেই শুধু বাকি। অথবা নিছক বাইরের ঘটনাকে (Externalities যা বাস্তবের বহিরাবরণ মাত্র) মানুষের পরিচয়-চিহ্নরূপে সাজিয়ে আমরা একটা স্কেচ বা খসড়া দাঁড় করিয়ে দিতে পারি,—ননী ভৌমিকের মত শক্তিমান্ লেখকেরও এই ত্রুটিই প্রধান ত্রুটি। কিম্বা তত্ত্বটার প্রয়োজনেই ঘটনা ও মানুষকে ছক-বাঁধা (schematic) রীতিতে সাজিয়ে তুলতে পারি—স্বয়ং মানিকবাবুও এ ভুল মাঝে মাঝে করেন। এ সব যা'ই করি—বস্তুবাদের নামে তাতে নানা রকমের ভাববাদের কবলেই গিয়ে আমরা পড়তে থাকি।

এসব ক্ষেত্রে আমাদের বস্তুবাদিতা জীবননিষ্ঠায় পরিণত হয় নি। আমরা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে—বিশেষ করে মানব-সত্যকে মানব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। দেখা যাচ্ছে বস্তুবাদী-সাহিত্যে রূপায়ণ-শৈথিল্যের কারণ শুধু কলানৈপুণ্যের অভাব নয়, আসলে এ হচ্ছে জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব ও অসম্পূর্ণতা। এক কথায়—মানুষকে না জানা। যেমন, ধরা-বাঁধা কথা হিসাবে আমরা শুনেছি—'সর্বহারার কিছু হারাবার নেই।' শুধু সেই শোনাকথা দিয়েই আমরা তৈরী করি সর্বহারা।

নিরঙ্কুশ একটি কল্পলোকের 'হেরো', শুধু 'নায়ক' নয়, একেবারে বীর ; মানুষ নয়, যেন একখানা ইশ্‌তাহার। দেখেও দেখি না যে, সর্বহারাও ভাবে তার স্ত্রীর কথা, পরিবারের কথা, এমন কি, আপনার কথাও। সেও প্রাণ দিতে দিতে রাখে প্রাণ বাঁচাবার আশা, আর প্রাণ বাঁচাবার কথা ভাবতে ভাবতেও আবার দেয় প্রাণ। এমন কি, আজন্ম-মধ্যবিত্ত আমি-আপনি ভাববাদী আদর্শে—স্বাধীনতার নামে বা সাম্যবাদের নামে—যতটা প্রাণ দিতে চাই রামভাই বা পারাণ হাজরা ততটা প্রাণ দিতে আকুলও নন। নিজের প্রাণের দামটা রামভাই আমার থেকে কম জানেন না। আমার ঘর দুয়ারের জন্য যেমন টান, সর্বহারা পরাণ হাজরার টিনের তোরঙ্গটার জন্য টান তার থেকে কম নয়। তবু সে-ই ইতিহাসের বিপ্লবীশক্তি। এই যে অদ্ভুত সত্য এ কথা জীবন থেকে না শিখে, না চিনে উঠলে আমরা বস্তুবাদ সম্বন্ধে ভাববাদী হয়ে উঠি, মনে করি রামভাই বা পরাণ হাজরা আর কিছুই নয়, একটি লাল ঝাণ্ডা। আর সেই ভাববাদী উৎসাহ বশেই সৃষ্টি-চেষ্টায় রূপায়ণকে অবজ্ঞা করি ; ভাবি content আর form বুঝি অহি-নকুল।

রুশ সাহিত্যিক টিখোনোভ-এর একটি কথা আছে—Truth is the hero of our Soviet literature. সমস্ত জীবন-নিষ্ঠ সাহিত্যেরই নায়ক এই সত্য। অবশ্য বলাই বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক সত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, সাহিত্যিক বা শিল্পী সে দৃষ্টিতে দেখেন না। এ কথা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যা সচরাচর ঘটে তা হচ্ছে এই যে, বস্তুবাদী সাহিত্যিক

তাঁর চার আনা সাধারণ অভিজ্ঞতার উপরে, ছ'আনা পুঁথিপড়া তত্ত্বের শিক্ষা ও ছ'আনা মনগড়া 'সম্ভাব্য বস্তুকে' (যা কল্পনা) মিশিয়ে দাঁড় করান তাঁর গল্প। ফলে এই বস্তুপিণ্ডের তলায় সত্য যায় তলিয়ে। লেখকের দৃষ্টি সেরূপ ক্ষেত্রে কখনো আক্ষরিক বা যান্ত্রিক, কখনো অতি-ভাববাদী। যেমন, তাঁর লেখায় কৃষকমাত্রই কেবল ফসলের স্বপ্নে পাগল; শ্রমিকমাত্রই প্রচণ্ড বিপ্লবী; মধ্যবিত্তমাত্রই অবক্ষয়িত—কেউ বিশিষ্ট মানুষ নয়, সবাই এরূপ টাইপ-মানুষ, 'প্রমাণ সাইজে' মেটে-বুরুজের দর্জি-কাটা 'চরিত্র'। অনেক সময়ে এবং অনেকাংশে জীবন-সত্যকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে জেনেও তিনি জীবনের জটিল প্রবাহ থেকে তা মানুষের মধ্য দিয়ে ছেঁকে তুলতে পারেন না। পুঁথি পড়াটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়, বরং পুঁথির থেকে তত্ত্ব জানাটা তাঁর বড় একটা পুঁজি, তাতে তাঁর সমাজ-চেতনার সূচনা হয়। কিন্তু পুঁথির জানাকে প্রথম জীবনের জানায়, তার পরে আবার সাহিত্যের জানায় পরিণত করা চাই। এজন্যই বলব নূতন গল্পের ত্রুটি শুধু আঙ্গিকের ত্রুটি নয়; বরং মূলের বস্তুবোধের ত্রুটি, সত্যবোধের ত্রুটি। এ ত্রুটি অবশ্য শোধরাবার প্রধান উপায়—জীবনকে সম্পূর্ণ জানা, আর সঙ্গে সঙ্গে জানা যে বিশেষ জীবন-সত্যটি যেখানে যে লেখক প্রকাশ করবেন সে সত্যটিকে—প্রত্যক্ষরূপে, সুস্থিররূপে,—মানব-আধারে। অর্থাৎ জীবনে জীবন মিশানো—কৃষাণের, শ্রমিকের জীবনের সরিক হওয়া।

'জীবনে জীবন যোগ'

কিন্তু কথাটাকে যান্ত্রিক-ভাবে গ্রহণ করলে এ কথাটাও মিথ্যা হবে। প্রথম কথা, 'জীবনে জীবন মিশানো' কথাটা স্থূল অর্থে গ্রহণ করলে বলতে পারি—কর্মীরাই ত তাহলে সত্যকারের সাহিত্যিক হতে পারে। কিন্তু একটা প্রধান কথা ভুললে চলবে না—সকল মানুষ সাহিত্যিক নয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকের একটা বিশেষ নেত্র আছে যাকে বল্‌তে পারি আর্টের তৃতীয় নেত্র; তা'ই তাঁর জীবন-দৃষ্টি সত্য-দৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টি যাঁর আছে কৃষাণের মজুরের জীবনের সরিক হলে তিনিই সেই জীবনের স্রষ্টা হতে পারেন।—অন্যেরা না হলে কর্মী হতে পারেন, নেতা হতে পারেন, সমাজ বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, কিন্তু সেই তৃতীয় নেত্রের অভাবে স্রষ্টা হতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, 'সরিক' হতে হলে কোন্ সাহিত্যিককে কি করতে হবে, তার কোনো যান্ত্রিক নির্দেশ দেওয়া চলে না। কেউ হয়ত হাজার কৃষক-মজুরের জীবনের অংশীদার হয়েও তা থেকে সাহিত্যিক সত্য নির্যাস করে নিতে পারবেন না;—তৈরী করবেন হয়ত বর্ণনা বা রিপোর্টাজ, ঘটনা-সমৃদ্ধ ডকুমেন্টারি, ইত্যাদি। আবার কেউ হয়ত অল্প কালের পরিচয়েও আয়ত্ত করতে পারেন তাঁর সেই সাহিত্যিক প্রয়োজন। কারণ, এ যোগটা কাল-পরিমাণ সাপেক্ষ বা ঘটনা-পরিমাণ সাপেক্ষ নয়, এ যোগটা হচ্ছে অনেকাংশে আত্মিক যোগ। কিন্তু কোনো আত্মিক যোগই ব্যবহারিক পরিচয়কে একেবারে বাদ দিয়ে লাভ করা

যায় না। একটা স্থূল দৃষ্টান্তেই তা বোঝানো যায় :—বাঙলার বিপ্লববাদের সঙ্গে একটু না একটু পরিচয় ও মনের যোগ বাঙালী সাহিত্যিকমাত্রেরই ছিল। কিন্তু সে পরিচয় সত্বেও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে একালের 'বনফুল' পর্যন্ত বাঙালী শিল্পীরা বাঙালী বিপ্লব-প্রয়াসকে সার্থক রূপ দিতে পারেন নি কেন? একটা নিবিড় পরিচয়ের অভাব তাঁদের ছিল, তাই আত্মিক যোগ তাঁরা স্থাপন করতে পারেননি—পান নি বিপ্লববাদ সম্পর্কে সেই সত্য-দৃষ্টি—জীবন-দৃষ্টি। তথাপি এই 'জীবনে জীবন যোগ' সম্বন্ধে দাগ কেটে প্রেস-ক্রিপশান্ করা চলে না—ক'দাগ করে কৃষাণের জীবনের সরিকানা সেব্য, অথবা ক'সপ্তাহ থাকতে হবে কৃষক-পল্লীতে, বা ক'মাস কাজ করতে হবে ট্রেড্-ইউনিয়নে, কিংবা ক'টা ছড়া বা গান বাঁধতে হবে কোনো আন্দোলনের জন্য কোন্ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ;—আর কতটা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জ্যোৎস্না, নদী ও পর্বতের ছোঁয়াচ বর্জন করে লিখতে হবে ফসলের নাম, কিম্বা মুখস্থ করতে হবে কল-কব্জার কথা। কিন্তু কথা এই—নির্দেশ না চলুক, এইসব জ্ঞান, এই পরিচয় শিল্পীর প্রয়োজন—যদি এরূপ মানুষ নিয়ে লিখতে হয়। পরিচয় যত ব্যাপক, যত গভীর হবে ততই তিনিও পাবেন আত্মপ্রত্যয়। না হলেই তাঁকে নিতে হবে কৌশলের সহায়তা। কৌশল আয়ত্ত থাকলে অবশ্য তা দিয়েও জ্ঞানের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু সবটা যায় না। অনুভূতির অকৃত্রিমতা নির্ভর করে পরিচয়ের উপরে ; আর সেখানে কৌশল অচল। একটা বর্তমানের

সুপরিচিত দৃষ্টান্ত নিই—সহিত্যিক সুবোধ ঘোষ আধুনিক সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক। তাঁর লেখা সার্থক যে কারণে তা হচ্ছে তাঁর রোমান্টিক কল্পনা ও নিজস্ব কলা-কৌশল—ভাবাতিশয্য সৃষ্টির কৌশল সুঠাম শব্দালঙ্কারে। কিন্তু কলাকৌশলে মানব-সত্য ওভাবে আছন্ন করলে আর্টেরই ক্ষতি। আরও গভীরতর অভিজ্ঞতার উপর বরং লেখকেরা নিজেদের সাহিত্যশক্তিকে দাঁড় করাবেন—এই হল আশা। নইলে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে কোন্ বিশেষ ধরণের লেখা কোন্ লেখক লিখবেন সে নির্দেশ দেওয়া নির্বুদ্ধিতা—লেখকের নিজ মন থেকে যদি তিনি নির্দেশ না পান। তবে যা অভিজ্ঞতার বাইরে, সে সম্বন্ধে মনও অন্ধ থাকে।

একটা সাধারণ প্রশ্নের এখনো উত্তর দেওয়া হয়নি—যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ সত্যই সার্থক স্রষ্টা তাঁরা কে কোন্ অভিজ্ঞতার গর্ব করতে পাবেন কৃষাণের মজুরের জীবনের? সাধারণ ভাবে বলা যায়—লেখকদের সে পরিচয় নেই। থাকলে তাঁরা টলষ্টয় হতেন। তা' নেই বলেই সাধারণত বাঙালী লেখকেরা কৃষাণ বা মজুরকে গল্পে টানেন না। মানিক বাবু কৃষক চরিত্র আঁকতে পারেন, তারাশঙ্করও তাতে উৎসাহী, সুশীল জানা, গুণময় মান্না আরও সফল। অন্যেরা কেউ কেউ তা টানলেও নিজেদের সংস্কার অনুযায়ী কৃষককে হাস্যকর বা কৃপার পাত্র বা ইতর মানুষরূপেই এক ঝলক দেখিয়ে ছুটি দেন। হয়ত তাঁদের জীবনদৃষ্টি সতর্ক থাকাতে ও রূপকর্ম আয়ত্ত থাকাতে

তাঁরা সে ছোট-পরিধির মধ্যেও সার্থকও হন। যেমন, উপরতলার শিল্পী দর্শক হিসাবে অচিন্ত্যকুমার সার্থকতা লাভ করেছেন তাঁর এরূপ কোনো কোনো গল্পে। নিজের অধিকার সীমা জানেন বলেই তাঁর মত বুদ্ধিমান শিল্পীরা এর বেশি অগ্রসর হন না—হলে কিরূপ অপকর্ম করে বসেন তার প্রমাণ সুবোধ ঘোষ ও বনফুল দিয়েছেন তাঁদের উপন্যাসে। শিল্পের অভাব তাঁদের নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতা-হীন চিত্র শুধু তাঁদের মাত্রাহীন অসংযত আক্রোশেরই প্রমাণ হয়ে রইল।

প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী হলেও সকলে জীবনের গতিশীল সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না—discontinuous continuityতে তাঁদের লক্ষ্য পড়ে না। তাঁদের লক্ষ্য হয় স্থাবরতা, staticism, অথবা শুধু continuity, অচিরস্থায়িত্ব। যেটুকু তাঁদের লক্ষ্য সেটুকু তাঁরা অনেকে অভিজ্ঞতা দিয়েই জানেন, তবে সে অভিজ্ঞতা হচ্ছে অংশের অভিজ্ঞতা,—আর যে অংশ আবার ম্রিয়মান, ক্ষয়িষ্ণু, তারই অভিজ্ঞতা। কাজেই সে অংশের রূপায়ণেও ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যায়। তথাপি যেটুকু তাঁরা জানেন ও জানাতে চান সেই ক্ষয়শীল সত্যটুকু—যা মিথ্যা-হয়ে-যাওয়া সত্যকে—তাঁরা অনেক সুপরিকল্পনায় সময়ে সময়ে সংহত করতে পারেন, আর তা কম কথা নয়। মানুষকে তা উদ্বুদ্ধ না করুক, আর্টের চাতুর্যে খুশী করে। তাঁদের বিবেচনায়—তা'ই সব; অন্তত এখনকার মত তা যথেষ্ট। কারণ খুশী করাটা

চরম সত্য না হোক সাহিত্যের প্রথম শর্ত—যা না হ'লে বুঝায় সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয় নি।

কিন্তু জীবনবাদী সাহিত্যিকের ধর্মটা আরও অনেক বড়। 'এখনকার মত' নয়, আগামী কালের মতও হাওয়া চাই তাঁর সৃষ্টি। অর্থাৎ শুধু খুশী করা নয়, আনন্দ দান করা; এবং জীবন সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে চেতনাকে প্রবুদ্ধ করা। এ জন্যই তাঁর চাই সত্যকে—ক্ষয়িষ্ণু সত্যকে নয়, নবজাত সত্যকে;—আর সমগ্র সত্যকে—যার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু ক্ষয়িষ্ণু হিসাবে গণ্য, নবজাতকও নবজাতক হিসাবে মান্য। Truth is his hero শুধু আনন্দ দান করা নয়, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নবতর সৃষ্টি-চেতনার উদ্বোধন—সাহিত্যের এই উদ্দেশ্য সে স্বীকার করে। আর এই সত্যকে পরোক্ষে লাভ করবার উপায় নেই। জীবনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে—নইলে তাঁর তৃতীয় নেত্রও উন্মীলিত হবে না। আর জীবন-সত্যকে জীবন থেকে আবিষ্কার করা, সকল বাহুল্য ছাড়িয়ে তাকে জীবন্ত করে, সংহত করে দেখা,—পরিকল্পনায় তাকে মূর্ত করে ধরা,—আর তারপরে সেই মূর্ত পরিকল্পনাকে রূপদান,—এর কোনোটাই কোনোটাকে ছেড়ে একেবারে চলে না,—অবশ্য একটার আংশিক ত্রুটি অন্যটায় খানিকটা দিয়ে মিটিয়ে নিতে পারা যায়, তবে তারও একটা মাত্রা আছে; —এই হল শিল্প-সাধনার পথ।

আধুনিক ছোটগল্পের সমস্যাটা হচ্ছে এই সাধনার সমস্যা।—সে সাধনার পাদপীঠ জীবনে জীবন যোগা করা, জীবনের সঙ্গে

পরিচয় ; তার পরিণতি মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগে,—আর সে সাধনার প্রকাশ কলাকর্মে। কিন্তু সমস্তটা একটা অখণ্ড সাধনা তাতেও ভুল নেই। তা হলে প্রথমও প্রধান প্রয়োজনটা কিসের ? জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের, মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগের। তারপরে মৌলিকতার।

জীবন-নিষ্ঠা ও মানব-স্বীকৃতি—এই হল কথা সাহিত্যিকের বিশিষ্ট সাধনা। তারপর আসে আঙ্গিক, প্রকাশ নৈপুণ্য, ও দৃষ্টির মৌলিকত্বের কথা। শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প খণ্ডের মধ্য দিয়ে, জীবনের একটা অর্থ, মানুষের একটা মৌলিক পরিচয় আমাদের চেতনায় আভাসিত করে বলেই শ্রেষ্ঠ ; নইলে তা উপভোগ্য গল্প মাত্র।

বাং ১৩৫৮

পুনশ্চ

নববাবু বিলাস

প্রায় দশ বৎসরের (ইং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬) বাঙলা সাহিত্যের সাধারণ হিসাব নিতে গিয়ে দেখা যায়, সেই স্বাধীনতার সাহিত্যের প্রাথমিক গান্ধীটুপির পালা শেষ হয়ে গিয়েছে ; আজ আর কেউ গান্ধীবাদী আধ্যাত্মিকতার নাম-গন্ধও করেন না। যাঁরা করেন, যেমন নব পর্যায়ের তারাশঙ্কর, তাঁরা সাহিত্যে তৈলপুষ্ট, কিন্তু বিগত-জ্যোতিঃ, পলতে বিশেষ। তবে 'সেক্স এণ্ড রিলিজিয়ন' এই যুগলধারা প্রবহমান; সিনেমা-সেবী সাহিত্যও প্রবলতর। অপরপক্ষে যাঁদের আশায় রবীন্দ্রনাথ কান পেতে ছিলেন,—কৃষাণের শ্রমিকের জীবনের সরিক যে জন,—সেই সাহিত্যিকের পদপাতও তত সুনিশ্চিত হয় নি। নতুন কয়েকজন কবি ও নতুন দু'একজন কথা সাহিত্যিকের পদধ্বনি অবশ্য শোনা যায় ; কিন্তু প্রকাশ-বৈচিত্র্যে ও কলাকর্মে এইদিককার লেখকেরা অনেকেই এখনো অনবহিত। নতুনতম যে ধারাটা সাহিত্যে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু পুরাতন বনেদি বিষয় ও ভারিক্কী চালকে এড়িয়ে, এবং ভূমিজ নতুন বিষয় ও মোটা চালকে আরও দূরে রেখে, সরে এসেছে অন্য এক খাতে—'সুবাবির' সীমানায়। লঘুপক্ষ প্রজাপতি-মার্কা নর-নারীর নিত্যনব ব্যসন, বিশেষ করে তাদের কামনা-বাসনার বিলাস-লীলাই, এই আহেলি সাহিত্যের উপজীব্য। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে

কালোবাজার ও চোরাবাজারের দৌলতে একটা দৌলতমন্দ শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্যলাভ ঘটেছে, তা আমরা জানি। 'স্ববাবির' সাহিত্যেও তাদেরই কুব্জ ও ন্যুব্জ প্রতিফলন পড়ে। এর পর যদি সত্য সত্যই ভূমি-সংস্কার ও কৃষক-বিপ্লবের সঙ্গে শিল্পায়ন ঘটে, এবং তাতে নতুন সমাজ-শক্তি জাগ্রত হয়, তা হলে অন্য কথা। না হলে এখন পর্যন্ত বলা যায়—এই পরিকল্পনা-প্রয়াসেরও উপরে নীচে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই ভূমিভ্রষ্ট নর-নারীরই লুণ্ঠনের ও বিলাসের সুযোগ ঘটেছে। ক্যাবারে নাইট ক্লাব থেকে নানা সামাজিক উৎসবে তাদের জলুষ প্রত্যক্ষ। এদের 'কালচারের হুল্লোড়' শুধু সিনেমাতেই সীমাবদ্ধ নয়, রেডিও একাডমির সরকারি পাড়ায়ও তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, আর স্বভাবতই সাহিত্যও তাতে সর-গরম। একদিকে ডি, এচ., লরেন্স অন্য দিকে সমারসেট মম,—দেহতত্ত্বের বিকৃত বন্দনা আর রকমারি বিলাস-বর্ণনা,—এ সাহিত্যের প্রলুব্ধ অনুকরণের আদর্শ। অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে নূতন প্রসাদ তাতেও জুটেছে—হয়ত একটু ধার-করা বিষয় ও একটু চুরি-করা আঙ্গিক। প্রবৃত্তির কুণ্ঠাহীন বর্ণনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টায় প্রকাশ-বৈচিত্র্যও কি আস্‌ছে না? আস্‌ছে। আর তা ছাড়া, এঁদের হাল্‌কা হাতের লঘু টানে, রঙের ছোপে, মিষ্টি কথায়—মন ভোলে, তাতেও ভুল নেই। অর্থাৎ আগেকার 'স্ববারি' সাহিত্যেরই ধারায় যোগ হয়েছে এখন (সমালোচকের ভাষায়) 'সফিস্টিকেশন' বা 'বিলাস সাহিত্য' এবং নতুনতর 'ডিকেডেণ্ট'

বা অবক্ষয়ী সাহিত্য,—উড়ো-উড়ো পাখার ও ভুরো-ভুরো গন্ধের গল্প ও উপন্যাস। এসব গল্পে-উপন্যাসে অবশ্য কেউ গভীর কথা আশা করে না,—জীবনের কথাও না, মানুষের পরিচয় ও না। সাহিত্যের "সৌখীন মজদুরী" বল্‌লে একেই তা বলা সার্থক, এ হচ্ছে বিংশ শতকের নববাবু বিলাস।।

হয়ত নূতন সমাজ-শক্তি জন্ম না মিতে মানুষের নতুন স্বীকৃতি পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌বেনা। ততক্ষণ সাধারণ মানুষ ও তার বহুকালের অনাদৃত জীবন-ধারার প্রতি যাঁরা দরদ রাখেন—আর সাহিত্যের এলেকা যাঁরা প্রসারিত করে দিতে চান—তাঁরা যদি নিজেদের সেই সুস্থ অনুভূতিকে সাহিত্য-সম্মত কলাকর্মে ও মৌলিকতায় প্রকাশিত করেন, তা হলে তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রত্যাশা সার্থক করতে পারবেন—হাল্‌কা রোমাণ্টিকতা ও কথার চাতুর্যে কী যায় আসে?

আর একটি কথা। এই রোমাণ্টিকতার তাগিদেই এ সময়ে বাঙলা কথা-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে তথাকথিত 'পিরিয়ড নভেল' বা 'পার্বিক কাহিনী'। তার একটা কারণ বোধ হয়—নিজের কালের সঙ্গে শিল্পীর মানসিক যোগাযোগ স্বচ্ছন্দ নয়; তাই অতীতের মধ্যে তিনি কল্পনা-সৌধ গড়বার স্বাধীনতা খুঁজছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও একটা তাগিদ এভাবে আসে; অন্য তাগিদ আসে ঐতিহাসিক বোধ থেকে ও মানুষের চরিত্রকে ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার মধ্যে উপলব্ধি করার থেকে। তা রোমাণ্টিক পদ্ধতিতেও হতে পারে,—সুপরিচিত

দৃষ্টান্ত হচ্ছে ডিকেন্সর এ টেল অব টু-সিটিজ্‌;—বাস্তব-পদ্ধতিতেও তা হতে পারে, যেমন, থ্যাকারের হেনরি এস্‌মণ্ড ;—আর এ দু পদ্ধতির সম্মেশ্রণও যে প্রায়শ ঘটে তাও আমরা জানি। কথাটা তাই শুধু রোমান্টিকতার বা বাস্তবতার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা বিশেষ করে হচ্ছে প্রথমত, জীবন-বোধের ও মানব-সত্যের (যা সব নবেলের প্রশ্ন); দ্বিতীয়ত, পার্বিক সত্যবোধ (যা পার্বিক উপন্যাসের অলঙ্ঘনীয় দাবি), পড়ে-শুনে পর্বের অন্তরে প্রবেশলাভ না করলে যা সম্ভব হয় না। হাল্‌কা রোমান্টিকতার দোষ এই যে, এই দুই মূল প্রশ্নকেই তা পাশ কাটিয়ে যায়। পর্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে না ধরতে পারলে মৌলিক ত্রুটি ঘটে; তারপর কতকটা পার্বিক উপকরণ মিশিয়ে সেকালের নামে কতকগুলি আজগুবি মানুষও ছবিকে জোড়াতালি দিয়ে উপাস্থত করলে সে ত্রুটি দূর হয় না। পার্বিক অবস্থার সঙ্গে বাহ্য সঙ্গতি ও বাহ্য অসঙ্গতির ত্রুটি সে তুলনায় তুচ্ছ। এসব উপন্যাসে অভাব ঘটছে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির, পর্ব-বোধের, ইতিহাস বোধের, মানুষের চরিত্রের গভীরতর সমাক্ষার; লাভ হয়েছে কল্পনা-বিলাসের, অসুস্থচিত্ত (নিওরোটিক) চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে প্রশংসনীয় কলা-কৌশলের ও পর্বসম্বন্ধীয় কৌতূহল সঞ্চারের কিছু দৃষ্টান্ত।

নিশ্চয়ই এ সব দুর্লক্ষণ সত্বেও বল্‌ব, বাঙলা সাহিত্য মানুষকে কোথাও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেনা—যেমন দেখে আজকে পাশ্চাত্য সাহিত্যিক, নব্য ক্যাথোলিক ও এক্‌জিষ্টেন্সিয়ালিষ্ট।

বৈশাখ—১৩৬৩ বাং